৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

We'll start at 7:10pm Thank you dear :)

লেকচার: ০৬

টপিক:

খাদ্য ও পুষ্টি (Food & Nutrition): খাদ্যের উপাদান, কার্বোহাইড্রেট, আমিষ, চর্বি ও লিপিড, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের প্রকারভেদ এবং উৎস, পুষ্টিগুণ, সুষম খাদ্যের তালিকা, সুষম খাদ্যের পিরামিড, বডি মাস ইনডেক্স, (BMI), ফাস্টফুড অথবা জাংকফুড, খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিকের ব্যবহার এবং তার শারীরিক প্রভাব।

খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য উপাদান

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট হলো-মানবদেহের কর্মশক্তি ও তাপশক্তির প্রধান উৎস। মানুষের প্রধান খাদ্য শর্করা। কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H_2) ও অক্সিজেন (O_2) নিয়ে শর্করার যৌগ গঠিত হয়। এর রাসায়নিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$.

শর্করার উৎস:

চিনি, মধু, মিষ্টি ফল (আম, আঙ্গুর, কলা, কাঁঠাল, খেজুর ইত্যাদি), আখের রস, গুড়, খেজুরের রস, চাল, গম, ভুট্টা, আলু, কচু

খাদ্য ও পুষ্টি

শর্করার প্রকারভেদ

- **এক অণু শর্করা:** গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও গ্যালাক্টোজ।
- **দ্বি অণু শর্করা:** সুক্রোজ, মলটোজ ও ল্যাক্টোজ।
- **বহু অণু শর্করা:** শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজ।

শর্করার কাজ:

- ✓ দেহের প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন করা।
- ✓ শক্তি যোগান দেয়া।
- ✓ প্রোটিনের অপচয় রোধ করা।
- ✓ বিপাকীয় কাজে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা।
- ✓ সেলুলোজ নামক আঁশযুক্ত শর্করা দেহের অপাচ্য পদার্থ বের করে।
- ✓ কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করতে সাহায্য করে।

আমিষ বা প্রোটিন

আমিষ বা প্রোটিনের গঠন উপাদান হলো- কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O) এবং নাইট্রোজেন (N)। আমিষে ১৬% নাইট্রোজেন থাকে। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মৌল সমন্বয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়, যা আমিষ বা প্রোটিনের গঠন একক। একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলিত হয়ে পলিপেপটাইড ও পরিশেষে প্রোটিন গঠিত হয়।

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড

- লাইসিন
- লিউসিন
- আইসোলিউসিন
- মিথিওনিন
- ট্রিপটোফ্যান
- ভ্যালিন
- ফিনাইল অ্যালানিন
- থ্রিওনিন।

আমিষের কাজ:

- দেহ কোষ ও পেশি গঠন।
- ক্ষয়পূরণ।
- দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি।
- দেহকে এডিমা (শরীরে পানি জমা) হতে রক্ষা করা।

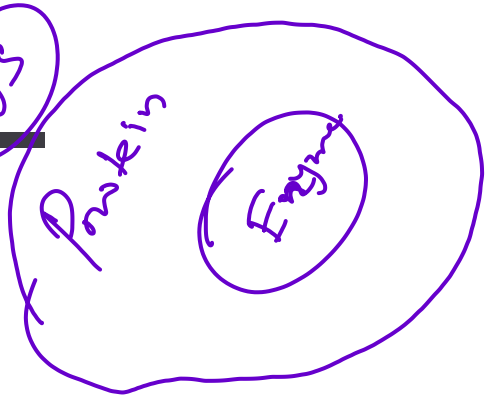

সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়।

প্রোটিন হলো অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত বৃহদাকার যৌগিক জৈব অণু। আর যে প্রোটিন জীবদেহে অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থেকে ও বিক্রিয়ায় অপরিবর্তিত থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে তাকে এনজাইম বলে। যেসকল প্রোটিন বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করতে অংশ নেয় না তারা এনজাইম নয়।তাই সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়।

খাদ্য ও পুষ্টি

স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট

- তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্য উপাদানকে স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট বলা হয়।
- ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে স্নেহ পদার্থ গঠিত।
- চর্বি হলো সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড।
- সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি তেলগুলো অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড।
- ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ হতে প্রায় ৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

স্নেহ পদার্থের কাজ

- ✓ স্নেহ পদার্থের প্রধান কাজ দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা।
- ✓ স্নেহ পদার্থ দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।
- ✓ দেহে সঞ্চিত হয়ে ভবিষ্যতের খাদ্য ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।
- ✓ ত্বকের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা বজায় রাখে।
- ✓ চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।
- ✓ স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন-এ, ডি, ই এবং কে শোষণে স্নেহ পদার্থ সাহায্য করে

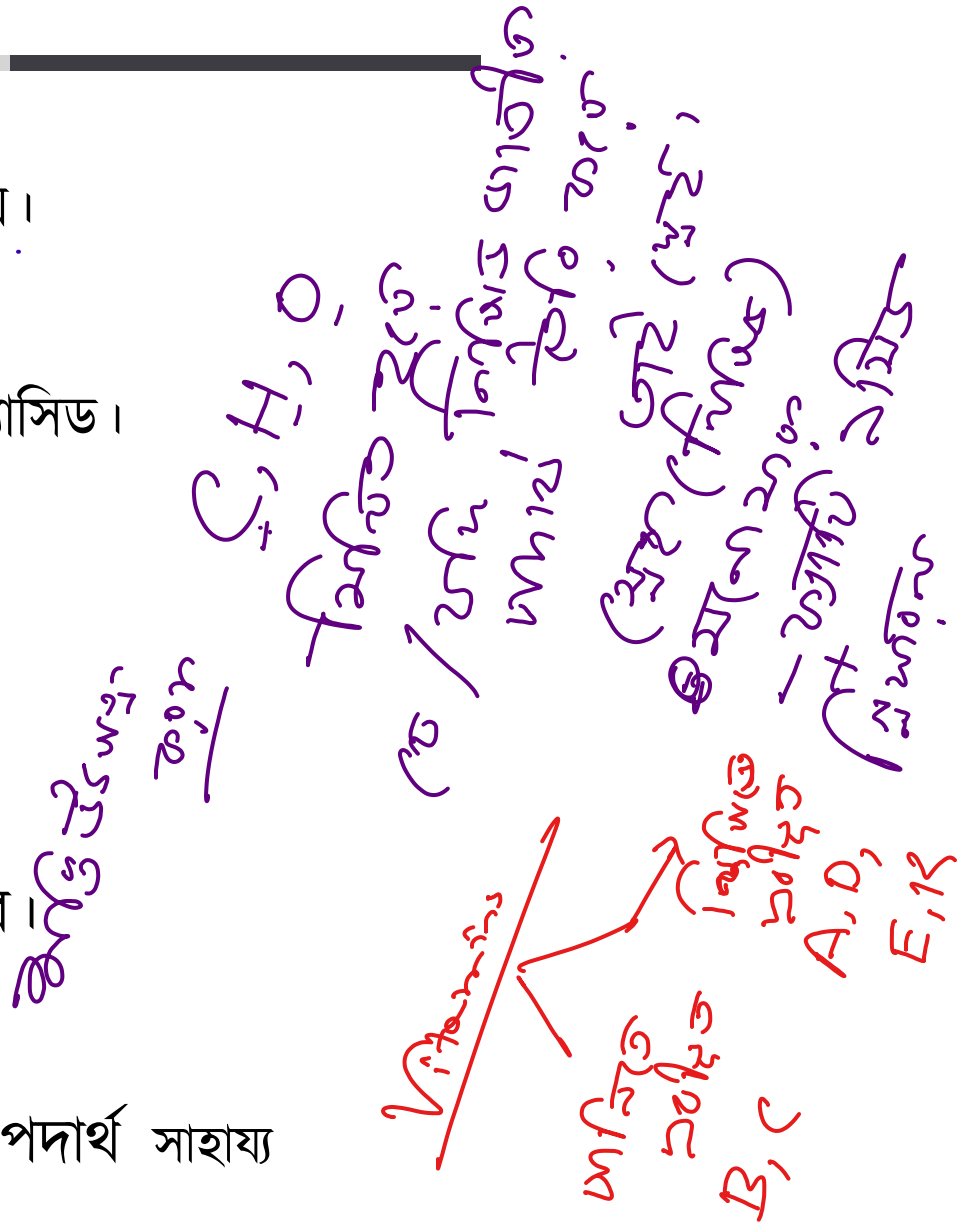

কোলেস্টেরল

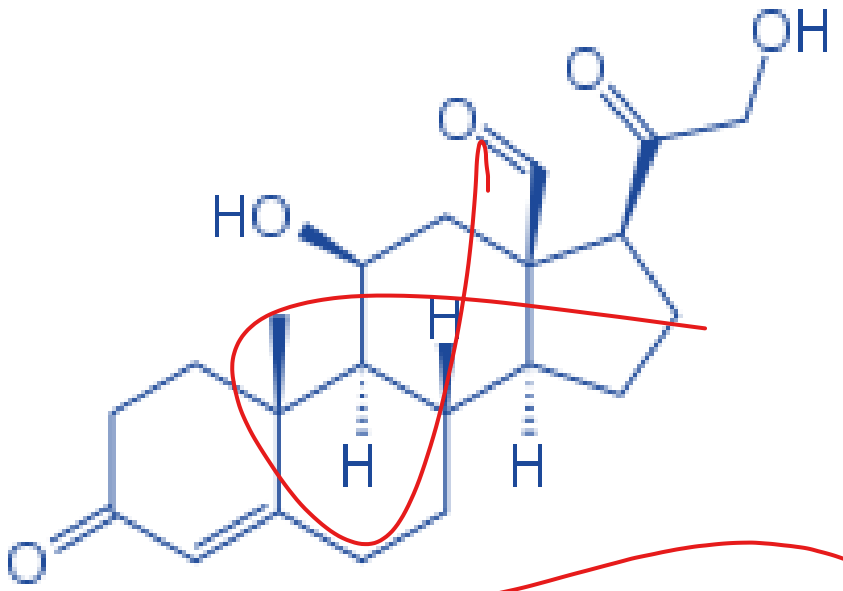

সাধারণত কোলেস্টেরল দুই ধরনের হয়। যথা:

১. LDL = Low Density Lipoprotein

২. HDL = High Density Lipoprotein

খাদ্য ও পুষ্টি

দেহের কোলেস্টেরল কমানোর উপায়:

- ✓ শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা।
- ✓ চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা।
- ✓ অধিক কোলেস্টেরল আছে এমন খাবার কম খাওয়া। যেমন- চর্বিযুক্ত মাংস, গরুর মগজ, খাসির কলিজা, ডিমের কুসুম, চিংড়ি মাছ, পনির বা দুগ্ধজাত খাবার।
- ✓ প্রচুর ফলমূল ও শাকসবজি জাতীয় খাবার গ্রহণ করা।
- ✓ ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ বেশি আছে এমন মাছ খাওয়া, যেমন- স্যালমন ও টুনা মাছ।
- ✓ খাদ্যে অতিরিক্ত লবণের ব্যবহার সীমিত করা।
- ✓ ধূমপান ত্যাগ করা, নিয়মিত ব্যায়াম করা।

লিপিড

বিশেষ ধরনের স্নেহজাতীয় পদার্থ। রসায়ন বিজ্ঞানে কার্বন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত যে সব সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত যৌগিক পদার্থ পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু ইথার, এ্যাসিটোন, বেনজিন ও ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়, তাদেরকে লিপিড বলা হয়।

- সরল লিপিড
- যৌগিক লিপিড
- উৎপাদিত লিপিড

জীবদেহে লিপিডের ভূমিকা: লিপিড জীবদেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেল মেমব্রেন থেকে শুরু করে অধিকাংশ কোষ অঙ্গাণুর আবরণী ফসফোলিপিড দিয়ে তৈরি। ফসফোলিপিড এদের গঠন উপাদান ছাড়াও কোষের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের আদান প্রদানেও বিশেষ অবদান রাখে। লিপিডের অভাবে কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া নামক অঙ্গাণুটি কার্যকারিতা হারায়, ফলে বায়বীয় জীব বেঁচে থাকার জন্য শক্তি উৎপাদন ব্যাহত হয়। লিপিড দিয়ে তৈরি ক্যারোটিনয়েডস, স্টেরয়েড হরমোন বা ভিটামিন এ, ডি, কে, ই প্রভৃতি জীবদেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

লিপিডের কাজ:

- চর্বি ও তেল জাতীয় লিপিড উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। বিভিন্ন তেল বীজের (যেমন- সরিষা, তিল, সয়াবিন ইত্যাদি) অঙ্কুরোদগমকালে লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। এদের বিজারণকালে অধিক ATP তৈরি হয়।
- ফসফোলিপিড ও গ্লাইকোলিপিড সেল মেমব্রেন ও অন্যান্য কোষ অঙ্গাণুর মেমব্রেন গঠনকারী পদার্থ হিসেবে কাজ করে।
- মোম জাতীয় লিপিড পাতার বহিরাবরণে স্তর অর্থাৎ কিউটিকল সৃষ্টি করে অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ করে।
- কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোলিপিড কাজ করে। এছাড়া ফসফোলিপিড আয়নের বাহক হিসেবেও কাজ করে।
- সালোকসংশ্লেষণে গ্লাইকোলিপিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
- প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে লিপোপ্রোটিন গঠন করে এবং লিপোপ্রোটিন শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে।

খাদ্য ও পুষ্টি

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

ভিটামিন এমন সব জৈব রাসায়নিক উপাদান যেগুলো দেহে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় কিন্তু [redacted] ভিটামিন দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়।

ভিটামিনের প্রকারভেদ:

দ্রবণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ভিটামিনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১.

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন:

ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন-সি।

২.

স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন:

ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-ই এবং ভিটামিন-কে।

ভিটামিন বি কমপ্লেক্স

ভিটামিন	অভাবজনিত রোগ
থায়ামিন বা ভিটামিন বি১	দীর্ঘদিন ভিটামিন বি১ এর অভাবে বেরিবেরি রোগ দেখা দেয়। এছাড়া স্নায়ুর দুর্বলতা, অরুচি, মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।
রাইবোফ্ল্যাভিন বা ভিটামিন বি২	এর অভাবে জিহ্বায়, ঠোঁটের কোণায় ও মুখের ভিতরে ঘা দেখা দেয়। ত্বক খসখসে হয়ে যায়।
নিয়াসিন বা ভিটামিন বি৩	এর অভাবে পেলেগ্রা রোগ হয়। ফলে, ত্বকে লালচে দাগ পড়ে ও খসখসে হয়ে যায়।
পিরিডক্সিন বা ভিটামিন বি৬	এর অভাবে অরুচি, বমিভাব ও রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।
কোবালামিন বা ভিটামিন বি১২	এর অভাবে রক্তশূন্যতা হয় ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষয় সাধিত হয়।

ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড

কাজ	অভাবজনিত অবস্থা
✓ দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে। ✓ ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে। ✓ ক্ষতস্থান দ্রুত পুনর্গঠন করে। ✓ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে। ✓ আমিষ ও স্নেহ পদার্থ বিপাকে সাহায্য করে।	দীর্ঘদিন ধরে এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়, ত্বকে ঘা হয়, ক্ষত শুকাতে দেরি হয়। দাঁত দুর্বল হয়ে অকালে ঝরে পড়ে, অস্থির গঠন মজবুত হয় না, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও সহজে ঠাণ্ডা লাগে। এছাড়া চুল পড়ে ও অরুচি হয়।

ভিটামিন এ

কাজ	অভাবজনিত অবস্থা
✓ দৃষ্টি শক্তি ঠিক রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। ✓ দাঁত ও অস্থি গঠনে সহায়তা করে। ✓ দেহের বিভিন্ন আবরণী কলা যেমন- ত্বক, চোখের কর্নিয়া, বৃক্ক ইত্যাদি স্বাভাবিক ও সজীব রাখে। ✓ রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।	এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। দীর্ঘদিনের অভাবে ব্যক্তি জেরপথালমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ভিটামিন ডি:

কাজ	অভাবজনিত অবস্থা
হাড় ও দাঁত গঠনে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কাজে সহায়তা করে।	এর অভাবে দাঁত উঠতে দেরি হয়, অস্থি বা হাড় গঠন সুদৃঢ় হয় না। শিশুদের রিকেটস রোগ হয়। শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।

ভিটামিন ই:

কাজ	অভাবজনিত অবস্থা
এটি একটি এন্টি-অক্সিডেন্ট যা ধমনীতে চর্বি জমা রোধ করে, ত্বক সুস্থ রাখে, সন্তান জন্মদান ক্ষমতা বাড়ায়।	এর অভাবে প্রজনন ক্ষমতা কমে যায় এবং জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের মৃত্যু হতে পারে।

ভিটামিন কে:

কাজ	অভাবজনিত অবস্থা
রক্তপাত নিরাময়ে সাহায্য করে। হাড়ের ঘনত্ব উন্নত করে এবং হাড় ক্ষয়ে যাওয়া বা ভঙ্গুর হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে। হরমোনের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।	এর অভাবে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তপাত বেশি হয়।

খনিজ লবণ বা মিনারেল ও পানি

দেহের কাঠামো গঠন ও প্রাণ রাসায়নিক ভূমিকা পালনের জন্য খনিজ লবণ অপরিহার্য। দেহের পুষ্টিগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণসমূহ হলো-ক্যালসিয়াম, লৌহ, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, জিংক বা দস্তা, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরিন ইত্যাদি। খনিজ লবণ কম বা বেশি হলে শরীরে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধকালে দেহে খনিজ লবণের ভারসাম্যহীনতা অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করে। নিচে কয়েকটি খনিজ লবণের পুষ্টিগত তাৎপর্য আলোচনা করা হলো।

লৌহ বা আয়রণ (Fe):

কাজ	অভাবজনিত অবস্থা
লৌহ রক্তের লোহিত কণিকা বা হিমোগ্লোবিন তৈরি করে, রক্তে অক্সিজেন বহন করে।	লৌহের অভাবে রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা বা এনিমিয়া দেখা দেয়।

ক্যালসিয়াম (Ca):

কাজ	অভাবজনিত অবস্থা
অস্থি ও দাঁত গঠন করে, রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে, হৃৎপিণ্ডের পেশির স্বাভাবিক সংকোচনে সাহায্য করে।	শিশুদের রিকেটস এবং বয়স্ক মহিলাদের অস্টিওম্যালেশিয়া রোগ হয়। এছাড়াও শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হয়।

আয়োডিন (I)

কাজ	অভাবজনিত অবস্থা
থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন তৈরি করে, মস্তিষ্কের গঠন ঠিক রাখে, গর্ভাবস্থায় শিশুর বুদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে ইত্যাদি।	এর অভাবে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শিশু খর্বাকায় হয়, শিশু অবস্থা হতেই বুদ্ধির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে গলগণ্ড রোগ হয়।

জিংক (Zn):

কাজ	অভাবজনিত অবস্থা
✓ জিংক রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। ✓ এটি দেহের বিপাকীয় কাজে অংশ নেয়। ✓ এটি রুচি বাড়াতে সাহায্য করে। ✓ যৌন পরিপক্কতা এবং বংশ বৃদ্ধির সক্ষমতা অর্জনে জিংক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ✓ চর্ম রোগ প্রতিরোধে এবং হাড়ের বৃদ্ধিতে জিংক ভূমিকা রাখে।	এর অভাবে খিদে কমে যায়, বিলম্বিত বৃদ্ধি হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

সুষম খাদ্য

দেহের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য উপাদান প্রয়োজন হয়। খাদ্যের ৬টি উপাদান শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পানি যে খাদ্যে সুষম মাত্রায় মিশ্রিত থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। সুষম খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের অনুপাত হলো ৪:১:১।

শারীরিক সুস্থতা রক্ষায় সুষম খাদ্য: চাহিদার তুলনায় কম বা বেশি খাদ্য গ্রহণ উভয়ই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয় এবং অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ পরিহার করা যায়। ব্যক্তি বিশেষের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত এ ধরনের খাদ্য সমাহারই সুষম খাদ্য। অর্থাৎ যেসব খাদ্য গ্রহণ করলে ব্যক্তি বিশেষের বয়স, লিঙ্গ, শ্রম অনুযায়ী তার প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও খাদ্য উপাদানের চাহিদা পূরণ হয়ে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে তাকেই সুষম খাদ্য বা ব্যালেন্সড ডায়েট (balanced diet) বলে। এককভাবে কোনো খাদ্যই সুষম খাদ্য নয়। সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করে নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ- একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দৈনিক ২৫০০-৩০০০ কিলোক্যালরি শক্তি পূরণ করতে হবে যাতে তার শক্তি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি খাদ্যের ছয়টি উপাদানের চাহিদাও পূরণ হয়। তবেই ঐ খাদ্য সামগ্রীকে ঐ ব্যক্তির জন্য সুষম খাদ্য বলা যাবে। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সবার জন্য সুষম খাদ্যের ধরন বা প্রকৃতি এবং পরিমাণ এক হবে না।

খাদ্য ও পুষ্টি

একেক জনের চাহিদা অনুসারে সুষম খাদ্য একেক ধরনের হবে। যেমন- শিশু ও বৃদ্ধদের খাদ্য সহজপাচ্য হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের খাদ্য তালিকায় চর্বিযুক্ত খাদ্য সীমিত করতে হবে। শিশু ও কিশোরদের খাদ্যে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং শক্তির জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য থাকতে হবে।

গর্ভবতী ও প্রসূতি বা দুগ্ধদানকারী মায়েদের খাদ্যে বাড়তি প্রোটিন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, শর্করা প্রভৃতি থাকতে হবে। গর্ভাবস্থায় মা ও তার অনাগত শিশুর সুস্থতার জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থা। এক হিসাবে বলা হয়েছে, গর্ভকালীন সময়ে মা এবং শিশুর সুস্থ থাকার জন্য গর্ভবতী মাকে স্বাভাবিক হিসেবের থেকে ৩০০ ক্যালরি বেশি খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। বৃদ্ধ বয়সের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণসমৃদ্ধ খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে। সেজন্য দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা প্রস্তুতের সময় সবার বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনা করেই খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হয়।

রাফেজ বা আঁশের গুরুত্ব:

- ✓ খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে ।
- ✓ পানি শোষণ করে মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ।
- ✓ শরীর থেকে অপাচ্য বস্তু বের করে দিতে সাহায্য করে ।
- ✓ দেহের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে ।
- ✓ মলাশয়ের ক্যান্সার, অর্শ্ব, অ্যাপেন্ডিকস, পিত্তথলির রোগ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা ইত্যাদি রোগ হ্রাসে সাহায্য করে।

খাদ্য ও পুষ্টি

সুষম খাদ্য পিরামিড

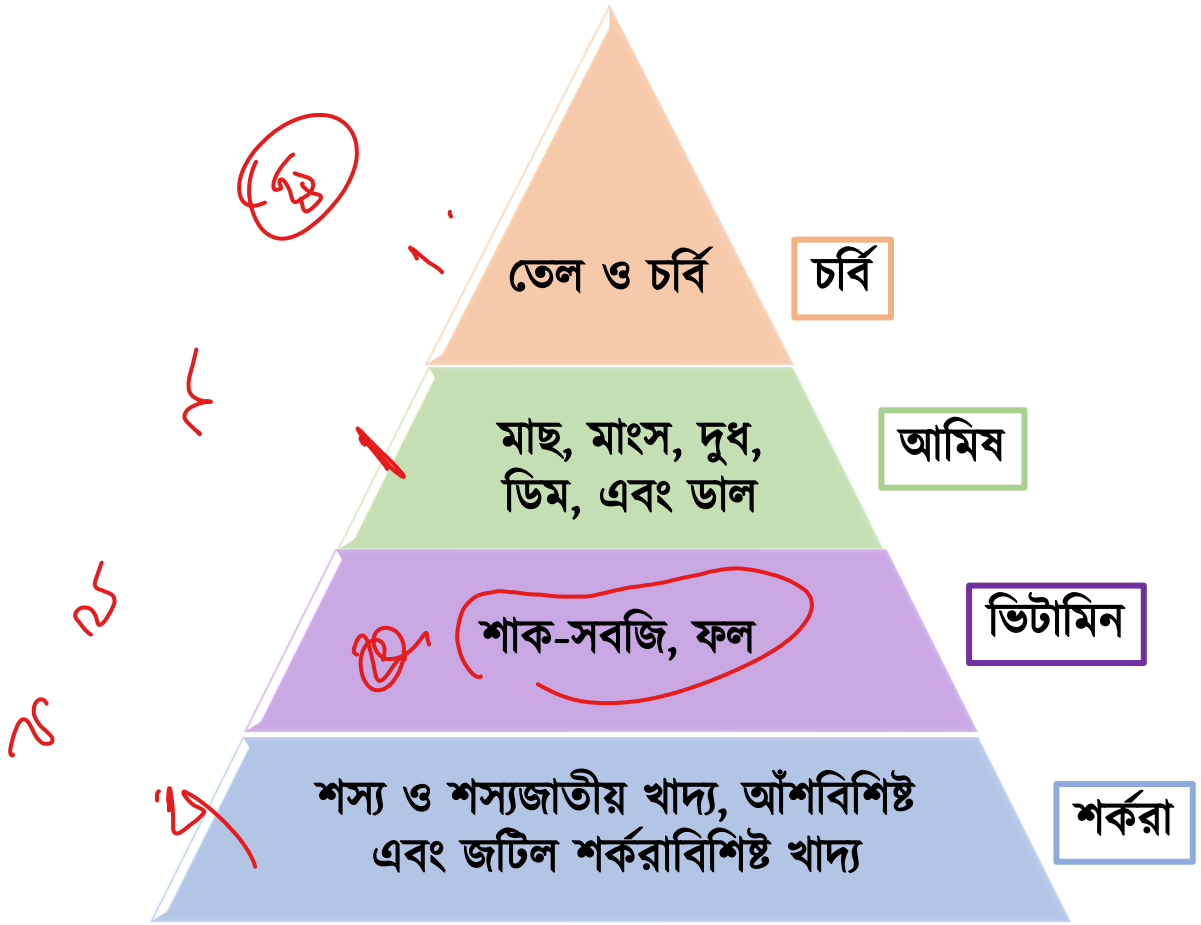

BMI বা দেহের ভরসূচি

$$\frac{\text{দেহর ওজন (কেজি)}}{\text{দৈহিক উচ্চতা (মিটার)}^{২}} \quad \text{বা,} \quad \frac{\text{body weight in kg}}{(\text{hight in mitre})^{2}}$$

বিএমআই (BMI) তালিকা:

শ্রেণি	BMI রেঞ্জ	শ্রেণি	BMI রেঞ্জ
কম ওজন	< ১৮.৫	স্থূলতা	≥ ৩০ – ৩৪.৯
স্বাভাবিক	১৮.৫ – ২৪.৯	স্থূলতা	৩৫ – ৩৯.৯
বেশি ওজন	২৫ – ২৯.৯	অতিরিক্ত স্থূলতা	≥ ৪০

ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড

ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড হচ্ছে এমন এক ধরনের খাবার, যা স্বাস্থ্যগত উপাদানের পরিবর্তে মুখরোচক স্বাদের জন্য উৎপাদন করা। সুস্বাদু করার জন্য এতে প্রায়শই অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেগুলো অস্বাস্থ্যকর। ফাস্টফুডে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে প্রাণিজ চর্বি ও চিনি থাকে।

অধিক পরিমাণে ফাস্টফুড গ্রহণে শরীরে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা নিম্নরূপ:

- ✓ বেশির ভাগ ফাস্টফুডে অধিক পরিমানে চিনি, টেস্টিং সল্ট, স্যাচুরেটেড চর্বি, প্রসেসড চর্বি ইত্যাদি উপাদান ব্যবহার করা হয় যা মুখোরোচক কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- ✓ ফাস্টফুডে ব্যবহৃত টেস্টিং সল্ট মানবদেহে গিয়ে ভেঙ্গে গ্লুটামেটে পরিণত হয়। গ্লুটামেট মস্তিষ্কের কোষ সমূহের মধ্যে নিউরো ট্রান্সমিটারের একটি উত্তেজক। গ্লুটামেটের অধিক উপস্থিতি মস্তিষ্কের নিউরন ধ্বংস করে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে।
- ✓ ফাস্টফুডের স্যাচুরেটেড ফ্যাট, প্রসেসড ফ্যাট, প্রসেসড ওয়েল প্রভৃতি উপাদান রক্তে LDL হিসেবে প্রবেশ করে এবং দেহে কোলেস্টেরল এর মাত্রা বৃদ্ধি করে। সহনীয় মাত্রার অধিক কোলেস্টেরল উচ্চ রক্ত চাপ, হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি, কিডনী, লিভারের কার্যকারিতা হ্রাস সহ অন্যান্য রোগের জন্য দায়ী।
- ✓ এই জাতীয় খাবারে মাত্রাতিরিক্ত ক্যালরি, টক্সিক উপাদান ইত্যাদি থাকায় দেহের ওজন বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা হ্রাস, বিষন্নতা, চুল পড়ে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যা দেখা যায়।

খাদ্য সংরক্ষণ

খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ:

- জীবাণুর আক্রমণ (যেমন- ছত্রাক বা বিভিন্ন অণুজীবের আক্রমণ)
- খাদ্যের মধ্যে এনজাইম বা উৎসেচকের ক্রিয়া।
- রাসায়নিক বিক্রিয়া।

খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি:

- **তাপ প্রয়োগ:** তাপ প্রয়োগ করে পাস্তুরাইজেশন, স্ফুটন ইত্যাদি পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় ১০০° সেন্ট্রিগ্রেডের উর্ধ্বে তাপ প্রয়োগ করে অণুজীবের ক্রিয়া ধ্বংস করা হয়। দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি অতি পচনশীল খাদ্য ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।
- **রোদে শুকানো বা শুষ্ককরণ:** প্রাচীনকাল থেকেই সূর্যের তাপে খাদ্যদ্রব্য শুকিয়ে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি প্রচলিত। রোদের তাপে খাদ্যশস্য ও ফলমূলের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত করে শুকিয়ে বোতলে, বোয়ামে বা কৌটাতে ভালো করে ঠেসে ভরে বাতাস বের করে সংরক্ষণ করা হয়। মাছ ও মাংসের ক্ষেত্রে ২০-২৫ দিন কড়া রোদে শুকানোর প্রয়োজন হয়। এরপরও মাঝে মধ্যে রোদে দেয়া দরকার হতে পারে।
- **রেফ্রিজারেশন:** এ পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে নিম্ন তাপমাত্রায় কাঁচা শাক-সবজি, ফল, রান্না করা খাদ্য, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য কিছুদিন পর্যন্ত ভালো রাখা যায়।
- **বরফে জমানো বা ফ্রিজিং:** এ পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য বাড়িতে ব্যবহৃত ফ্রিজে বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে টাটকা শাক-সবজি, ফল, ফলের রস, মাছ, মাংস, রান্না করা বা প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, আইসক্রিম, আলু, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।

- **সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগ:** রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা খাদ্যের পচন রোধ করা যায়। এগুলোকে সংরক্ষক (Preservative) বলে। খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করা এবং খাদ্যে যেন ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে না পারে সেজন্য রাসায়নিক সংরক্ষক ব্যবহার করা হয়। এগুলোর কোনো পুষ্টিগুণ নেই। তবে সঠিক পরিমাণের মাত্রা জেনে খাদ্যে সংরক্ষক প্রয়োগ করতে হয়। রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থগুলো বিভিন্ন ধরনের এবং ব্যবহারও বিভিন্ন রকম। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক সংরক্ষকের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

❖ সিরকা বা ভিনেগার

$$CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow{\text{[illegible]}} CH_3COOH + H_2O$$

- ❖ সালফেটের লবণ যেমন Sodium Bisulfite অথবা Potassium Meta Bisulfite ব্যবহার করে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায়।
- ❖ Benzoic Acid এর একটি লবণ Sodium Benzoate, যা বিশেষ করে ছত্রাক বা ঈস্ট এর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। ফলের রস, ফলের শাঁস ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য Sodium Benzoate খুব উপযোগী।
- ❖ Propionic Acid -এর লবণ এবং Sorbic Acid -এর লবণ Sorbates ব্যবহার করে দই, মিষ্টি, পনির, মাখন ও বেকারি সামগ্রী সংরক্ষণ করা হয়।

➢ **চিনি ও লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ:** চিনি ও লবণের দ্রবণে খাদ্য সংরক্ষণ একটি বহুল ব্যবহৃত সংরক্ষণ পদ্ধতি। আপেল, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি ফল টুকরা করে চিনির ঘন দ্রবণে বায়ুনিরোধী করে বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। লবণের দ্রবণ বা ব্রাইন দ্বারাও খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা হয়। যেমন- নোনা ইলিশ মাছ।

খাদ্যে বিষক্রিয়া (Food Poisoning)

ব্যাকটেরিয়া খাদ্য নষ্ট করে এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান তৈরি করে। একে টক্সিন বলে। টক্সিন উপাদান দেহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে খাদ্যে বিষক্রিয়া বা Food Poisoning হয়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ঈস্ট জাতীয় ছত্রাক জ্যাম, জেলি, ফলের রস, মিষ্টি আচার ইত্যাদি দ্রুত নষ্ট করে। এতে খাবার টক গন্ধ, ফেনাফেনা, ঘোলাটে হয়ে যায়। মোল্ড জাতীয় ছত্রাক পাউরুটি, কমলালেবু, টমেটো, পনির, টক আচার ইত্যাদি টক জাতীয় খাবার নষ্ট করে। এসব খাদ্য গ্রহণে বিষক্রিয়া হয়।

খাদ্য সংরক্ষণে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া:

- **ফরমালিন:** ফরমালিন হলো ফরমালডিহাইডের ৪০% জলীয় দ্রবণ। ফরমালিন একটি বিষাক্ত এবং ক্যান্সার উৎপাদক রাসায়নিক পদার্থ। দুধ, ফল, মাছ, মাংসকে পচন থেকে রক্ষা করার জন্য অতি লোভী অসাধু ব্যবসায়ীরা না বুঝে ব্যবহার করে থাকেন। এর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে লিভার ও কিডনি নষ্ট হওয়া, ক্যান্সার, বদহজম, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, পেটের পীড়াসহ নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। মেয়েদের গর্ভপাত এমনকি সন্তান বিকলাঙ্গ পর্যন্ত হতে পারে।

- **ক্যালসিয়াম কার্বাইড:** ফল বিশেষত কলা পাকানোর জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।ক্যালসিয়াম কার্বাইড হলো কালো দানাদার রাসায়নিক পদার্থ যা অত্যন্ত বিষাক্ত। এটি একটি যৌগ যা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে অ্যাসিটিলিন নামক গ্যাস উৎপন্ন করে- যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অ্যাসিটিলিন ইথিলিনের মতো ফল পাকাতে সাহায্য করে।

ইথিলিন (Ethylene): ফল নিজেই ইথিলিন তৈরি করে এবং পাকতে সাহায্য করে। ফল সৃষ্ট ইথিলিনকে ফলের হরমোন বলা হয়। কিন্তু একসঙ্গে ফল পাকাতে সারা বিশ্বে ইথিলিন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তখন ইথিলিনকে Ripening agent বলা হয়। আমাদের দেশে অপরিপক্ক ফল পাকাতে ইথিলিন গ্যাস তৈরি করে ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে। তাতে ফল সুমিষ্ট হয়। অতি অপরিপক্ক ফলে ইথিলিন ব্যবহার করা উচিত নয়। আম, কলা, পেঁপে, টমেটো ইত্যাদি পাকানোর জন্য ইথিলিন ব্যবহার করলে অন্তত ৭-৮ দিন পর তা বাজারজাত করা উচিত।

কালটার (Culter): এটি একটি হরমোন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। গাছে থাকা অবস্থায় এটি আমে প্রয়োগ করা হয়। এতে ফল দ্রুত পরিপক্ক হয় অথচ না পেকেই দীর্ঘদিন গাছে থাকে। ফলে, ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে বিক্রি করার সুযোগ পায়। কালটার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

WHAT IS ANTIOXIDANT

ANTIOXIDANTS
are a group of naturally-occurring substances that protect cells from **oxidative damage**

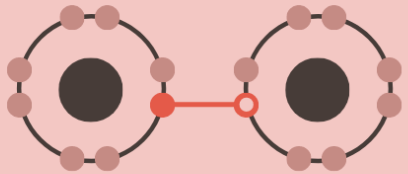

ANTI-OXIDANTS

FREE RADICALS

Antioxidants are touted to fight free radical damage by donating electrons to deactivate the free radical

OXIDATIVE DAMAGE is caused by

Free radicals

Environmental aggressors
UV and pollution

There is a delicate balance between free radicals & anti-oxidants to **protect skin from:**

Premature ageing

Hyper-pigmentation

Inflammatory conditions

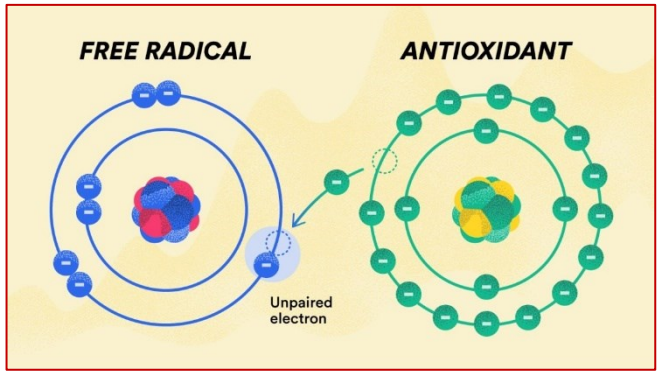

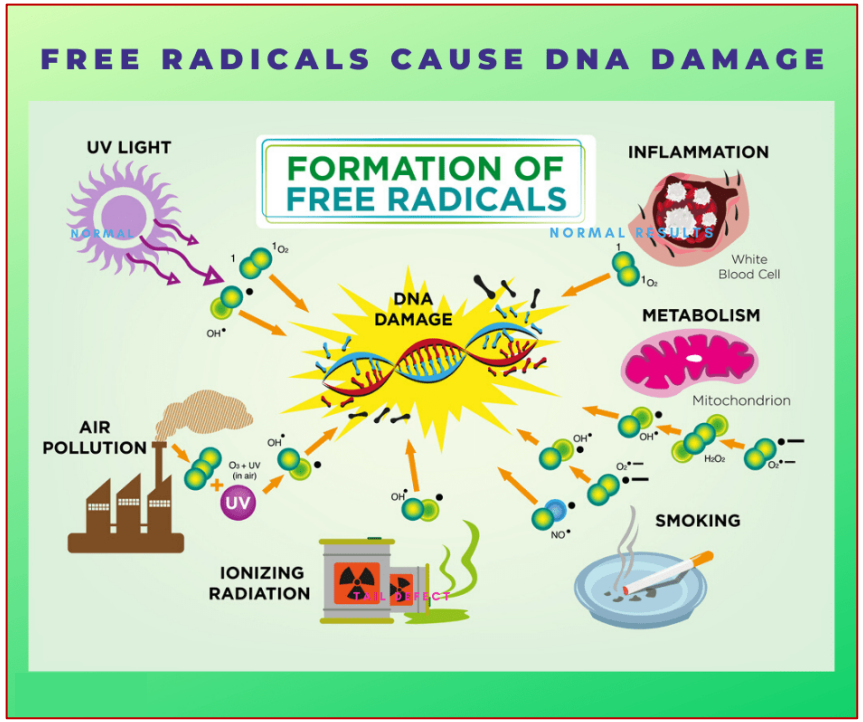

এন্টি-অক্সিডেন্ট:

এন্টি-অক্সিডেন্ট হলো এমন সকল উপাদান যা দেহের জন্য ক্ষতিকর অক্সিডেশন বা জারণ বিক্রিয়া প্রতিরোধ করে। এসকরবিক এসিড(Vitamin C), বিটা ক্যারোটিন, ইউরিক এসিড, গ্লুটা থায়ামিন, লিউটেন ইত্যাদি হলো এন্টি-অক্সিডেন্ট। এসব শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এন্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের ক্ষতিকারক অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর সঙ্গে লড়াই করে DNA কোষকে সুরক্ষিত রাখে। এছাড়াও এন্টি-অক্সিডেন্ট ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না। ক্যান্সার প্রতিষেধক হিসেবেও এটি পরিচিত। ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি, গ্রিন টি, লবঙ্গ, মটরশুঁটি, কালো আঙুর প্রভৃতি এন্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার যা হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিসসহ আরো মারাত্মক রোগ প্রতিরোধী হিসেবে কাজ করে।

ফ্রি-রেডিক্যাল:

ফ্রি-রেডিক্যাল হচ্ছে এক প্রকার উচ্চতর সক্রিয় অণু যা শরীরে মুক্তভাবে চলাফেরা করে। বিভিন্ন Oxidation বিক্রিয়ায় এগুলো সৃষ্টি হয়। এই মুক্ত অণুসমূহ শরীরের কোষকলার ধ্বংস সাধন করে বলে শরীরের জন্য ক্ষতিকর। হাইড্রক্সিল আয়ন, হাইড্রোজেন অক্সাইড ফ্রি-রেডিক্যালের উদাহরণ।

ফ্রি-রেডিক্যাল কোষের DNA ধ্বংস করে, কোষ মেমব্রেন নষ্ট করে এবং কোষকে মেরে ফেলে। বিভিন্ন কারণে দেহে ফ্রি রেডিক্যালের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেমন অতিরিক্ত পরিশ্রম সাধ্য ব্যায়াম, জীবাণুর সংক্রমণ ও ইনজেকশন, বায়ু দূষণ, রেডিয়েশন ইত্যাদি। ফ্রি-রেডিক্যালের অবাধ বিচরণ আমাদের দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকে বিঘ্নিত করে। ফ্রি-রেডিক্যাল আমিষ, চর্বি ও নিউক্লিক এসিডের সাথে বন্ধন তৈরি করে গঠনের পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে শরীরে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। যেমন: ক্যান্সার, হৃদরোগ, চর্মরোগ, ত্বক কুঁচকে যাওয়া, ত্বকে বলিরেখা পড়া, ত্বকের লাবণ্য নষ্ট হওয়া, অ্যালঝেইমার রোগ, পারকিনসন্স রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

অ্যান্টি মাইক্রোবায়েল এজেন্ট:

অ্যান্টিমাইক্রোবায়েল এজেন্ট হলো যেসকল রাসায়নিক প্রিজারভেটিভস যারা ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট ও মোল্ডস এর বৃদ্ধি প্রতিহত করে, এসব রাসায়নিক পদার্থ মাইক্রো-অর্গানিজমসমূহের কোষের মেমব্রেন ফাটিয়ে দেয় এবং এনজাইমের ক্রিয়া রোধ করে থাকে। এসব প্রিজারভেটিভ অম্লধর্মী হয়।

ফুড সেফটি ও ফুড সিকিউরিটির মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

ফুড সেফটি	ফুড সিকিউরিটি
ফুড সেফটি বলতে বোঝায় যেকোন ধরনের দূষণ থেকে খাদ্যকে রক্ষা করা।	ফুড সিকিউরিটি বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা।
ফুড সেফটি ব্যাপক অর্থে ফুড সিকিউরিটির অংশ	ফুড সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই ফুড সেফটি নিশ্চিত করতে হবে।
ফুড সেফটির জন্য নিম্নমানের, ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার করতে হবে।	ফুড সিকিউরিটির জন্য অধিক খাদ্য ফলানোর দিকে নজর দিতে হবে এবং গুণগত মান ও খেয়াল রাখতে হবে।
ফুড সেফটি বিষয়টি জাতিগতভাবে আমাদের সকলকেই মোকাবিলা করতে হবে।	ফুডি সিকিউরিটি মূলত দুই ধরনের হয়। যথা: পারিবারিক ফুড সিকিউরিটি ও জাতিগত ফুড সিকিউরিটি।
ফুড সেফটির মূলত খাদ্যে গুণগত মানকে নির্দেশ করে, পরিমানকে নয়।	ফুড সিকিউরিটি মূলত খাদ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং সবার সাধ্যের মধ্যে থাকে এই জিনিসটি নির্দেশ করে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়– ব্যাখ্যা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- ট্রাইগ্লিসারাইড কী? মানবদেহে এর ভূমিকা কী? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- আঁশ জাতীয় খাবার কী? মানবস্বাস্থ্যে এর গুরুত্ব লিখুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- একজন গর্ভবতী মায়ের দৈনিক সুষম খাদ্যের তালিকা দিন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- ফুড সেফটি ও ফুড সিকিউরিটি। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- মানবদেহে জিংক সমৃদ্ধ খাদ্যের ভূমিকা আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন কয়টি ও কী কী? মানবদেহে এই ভিটামিনগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- আধুনিক জীববিজ্ঞানে সকল উৎসেচক (enzyme) কে প্রোটিন বলা হয় না কেন? উদাহরণসহ যুক্তি দিন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- মনোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইড কী? এগুলো মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- আমাদের দেশে কী কী পন্থায় খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয় আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- লিপিড কী? লিপিডের বৈশিষ্ট্য ও কাজ উল্লেখ করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফ্রি-রেডিক্যাল কী? স্বাস্থ্য রক্ষায় এদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- চর্বি ও লিপিডের পার্থক্য লিখুন। মানব স্বাস্থ্যের সুষম খাদ্যের পিরামিড বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক সুষম খাদ্যের বিভাজন লিখুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের শারীরিক প্রতিক্রিয়া লিখুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান কী? প্রোটিন প্রধান মাছ ও মাংসের পুষ্টিগুণ আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা বিবৃত করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- Body Mass Index (BMI) এর গাণিতিক সমীকরণ লিখুন। ১.৭০ (1.70) মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ব্যক্তির BMI ২১ (21) হলে তাঁর দেহের ওজন কত? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- সুষম খাদ্যের প্রতিটি প্রচলিত উৎসের দুইটি উদাহরণ দিন। একটি সুষম খাদ্যে প্রোটিন এবং শর্করার অনুপাত কত হওয়া প্রয়োজন? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- গর্ভকালীন সময়ে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার মানবদেহে কি ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং উহার প্রতিকার কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- গুদামজাত খাদ্যদ্রব্যের স্থায়িত্বকাল কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- Body Mass Index (BMI) বলতে কী বুঝায়? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- BMI মানদৃষ্টে মানুষের শরীরের যত্ন কীভাবে নেওয়া উচিত- ব্যাখ্যা করুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- মানুষের শরীরে অধিক পরিমাণ ফাস্টফুড খাওয়ার প্রতিক্রিয়া কীরূপ? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Intermission

৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

লেকচার: ৭

টপিক: রোগ ও স্বাস্থ্যসেবা (Disease & Health Care): অভাবজনিত রোগ, সংক্রমণ, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিবায়োটিক, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, রক্তচাপ, উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া, মাদকাসক্তি, ভ্যাকসিনেশন, চোখের ত্রুটি, খাদ্যের বিষক্রিয়া, এক্সরে, আলট্রাসোনোগ্রাফি, সিটিস্ক্যান, এমআরআই, ইসিজি, এন্ডোসকপি, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, অ্যানজিওগ্রাফি এবং তাদের ব্যবহার, সতর্কতা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, ক্যান্সার, এইডস ও হেপাটাইটিসের মৌলিক ধারণা।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

DEFICIENCY

বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অভাব জনিত রোগ

পুষ্টি উপাদান	অভাবজনিত রোগ	পুষ্টি উপাদান	অভাবজনিত রোগ
শর্করা	দুর্বলতা	Vitamin B_{12}	রক্তশূন্যতা
আমিষ	মেরাসমাস	Vitamin C	স্কার্ভি
স্নেহ পদার্থ	বিভিন্ন চর্মরোগ	Vitamin D	রিকেটস, অস্টিওম্যালাশিয়া
Vitamin A	রাতকানা রোগ, জেরপথালমিয়া	Vitamin E	প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, অকাল গর্ভপাত
Vitamin B_1	বেরিবেরি	Vitamin K	রক্তপাত বন্ধ না হওয়া
Vitamin B_2	ঠোঁটের কোণায় ও মুখের চারদিকে ঘা	ক্যালসিয়াম	Osteoporosis
Vitamin B_3	Pellagra	ফ্লোরাইড	দাঁতের ক্ষয়
Vitamin B_5	Paresthesia	আয়রন	রক্ত শূন্যতা
Vitamin B_6	রক্তশূন্যতা	পটাশিয়াম	উচ্চ রক্তচাপ
Vitamin B_7	এক্সিমা, চর্মরোগ	আয়োডিন	গলগণ্ড
Vitamin B_9	রক্তশূন্যতা		

সংক্রামক রোগ

- বায়ু বাহিত রোগ:
- পানি বাহিত রোগ:
- প্রাণী বাহিত রোগ:
- যৌন বাহিত রোগ:
- স্পর্শ জনিত রোগ:

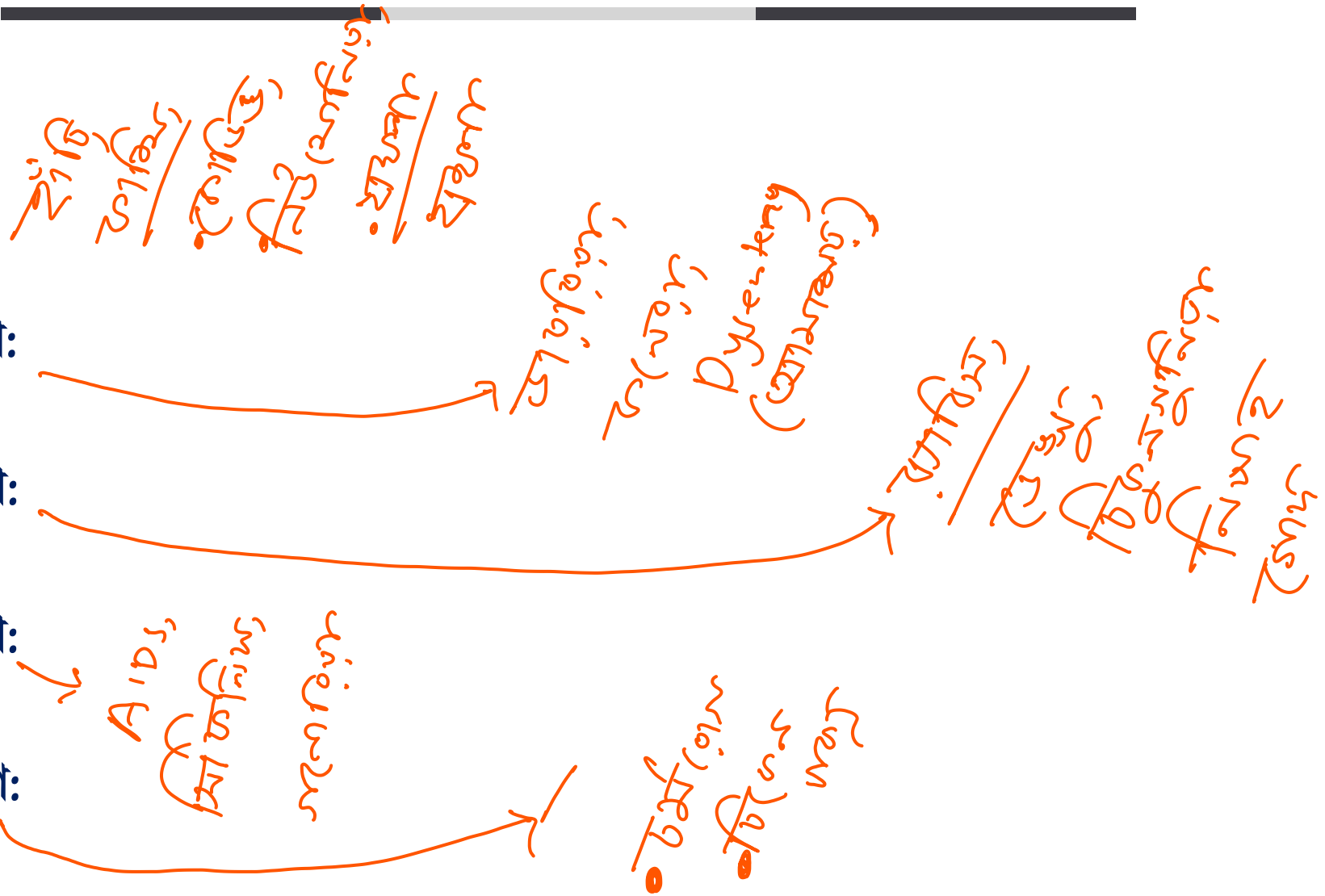

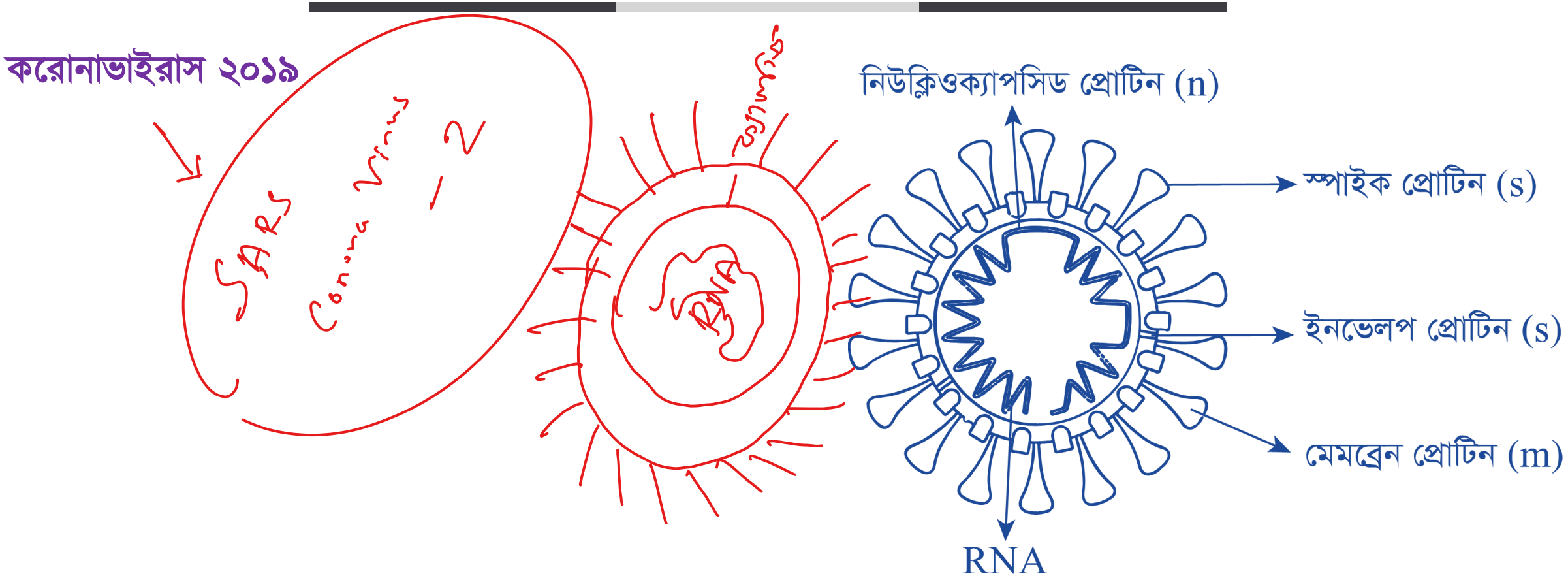

সংক্রামক রোগ

করোনাভাইরাস ২০১৯

অ্যান্টিসেপটিক

অ্যান্টিসেপটিক

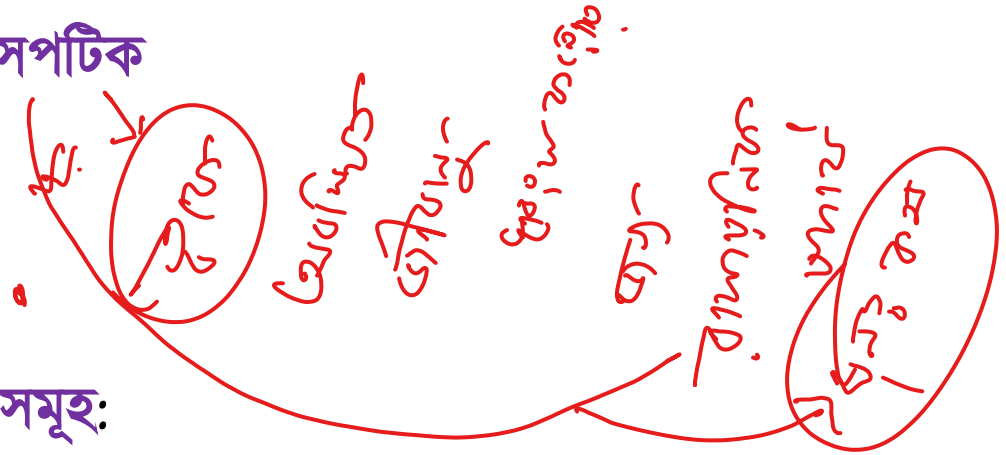

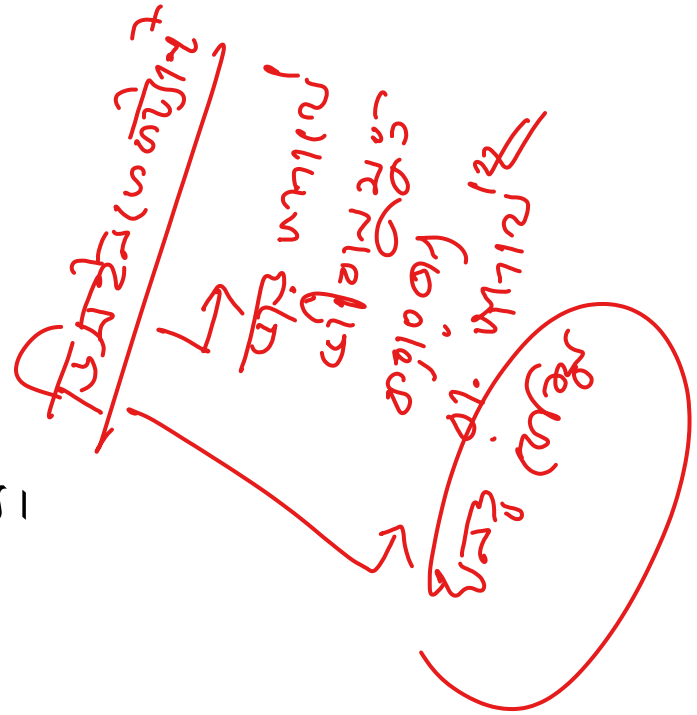

ব্যবহারসমূহ:

১. ত্বকে সংক্রমণ রোধ করা, বিশেষত ক্ষতস্থান বা ছোটখাটো পোড়ার জন্য।
২. হাত জীবাণুমুক্তকরণ।
৩. চিকিৎসা পদ্ধতির আগে ত্বক পরিষ্কার করা, যেমন- সার্জারি।
৪. মাউথওয়াশ বা লজেন্স দিয়ে গলা সংক্রমণের চিকিৎসা করা।
৫. সংক্রমণ চিকিৎসা করতে বা ক্যাথেটার ব্যবহার করার আগে শ্লেষ্মা ঝিল্লি পরিষ্কার করা।

অ্যান্টিবায়োটিক

অ্যান্টিবায়োটিক

রোগ প্রতিরোধে অ্যান্টিবায়োটিক: বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে আন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

- মূত্রনালির সংক্রমণ (Urinary Tract Infection):
- যক্ষ্মা (Tuberculosis):
- ছত্রাকের সংক্রমণ (Fungal Infection):

অ্যান্টিবায়োটিক

➢ **এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব ও প্রতিরোধ:** রোগাক্রান্ত দেহকে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাইরে থেকে যে সাহায্য আমরা নেই তার নাম এন্টিবায়োটিক। এটি ব্যাকটেরিয়াকে নিষ্ক্রিয় করে বা বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া নষ্ট করে এমনকি কখনো কখনো ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। এন্টিবায়োটিক সাধারণত নির্দিষ্ট সময় ধরে সেবন করলে জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়। তবে সময়ের আগে এন্টিবায়োটিক সেবন ত্যাগ করলে যে সকল জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়নি তারা ঐ এন্টিবায়োটিককে চিনে ফেলে। তারা তখন নিজেদের দেহে এমন কিছু পরিবর্তন করে ফেলে যে ঐ এন্টিবায়োটিক পরবর্তীতে আর তাদের উপর কাজ করে না বা জীবাণু ঔষধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হতে হবে। এন্টিবায়োটিক খেতে হলে কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায়, মিডিয়ায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে। স্বাস্থ্য বিভাগ ও ঔষধ প্রশাসনের এমন পদক্ষেপ নেয়া দরকার যেন উপযুক্ত প্রেসক্রিপশন ব্যতীত কেউ এন্টিবায়োটিক সংগ্রহ করতে না পারে। চিকিৎসকগণ কেন এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করছেন সেটিও ভেবে দেখা জরুরি। এছাড়া গবাদি পশু, মাছ চাষ ও ফসলী জমিতে যে এন্টিবায়োটিকগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে সেগুলো মানুষের শরীরে ঔষধ প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব ঘটাচ্ছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা দরকার।

অ্যান্টিবায়োটিক

অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিব্যাক্টোরিয়াল ও অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে তুলনা:

অ্যান্টিসেপটিক	অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল	অ্যান্টিবায়োটিক
➢ এটি সংক্রামক রোগবীজ নাশক পদার্থ যা জীবিত টিস্যুর উপর প্রয়োগ করা হয় যাতে ইনফেকশন এড়ানো সম্ভব হয়।	➢ অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল এমন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা ত্বকের বহিঃআবরণে [illegible] করে ব্যাক্টেরিয়া দূরীভূত করতে ব্যবহৃত হয়।	➢ যে জৈব রাসায়নিক ঔষধ দেহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিশেষ কোনো ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস বা বৃদ্ধিরোধ করে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক বলে।
➢ খোলা ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হয় জীবাণুমুক্ত করতে।	➢ ত্বকের বহিঃআবরণ পরিষ্কারে ব্যবহৃত হয়।	➢ দেহের অভ্যন্তরীণ ও কিছু ক্ষেত্রে বহিরাবরণীতে বিদ্যমান ব্যাক্টেরিয়া নাশ করতে ব্যবহৃত হয়।
➢ টিংচার আয়োডিন, ৭০% ইথানল, ফেনল, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, পোভিডন প্রভৃতি বহুল ব্যবহৃত অ্যান্টিসেপটিক।	➢ ইথাইল অ্যালকোহল, সাবান প্রভৃতি অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল গুণ ধারণ করে।	➢ পেনিসিলিন, সেপালোস্পিরিন, নিস্টাটিন ইত্যাদি অ্যান্টি বায়োটিকের উদাহরণ।

স্ট্রোক

স্ট্রোক

স্ট্রোক ব্রেন বা মস্তিষ্কের রোগ, হৃদরোগ নয়। মস্তিষ্কের রক্তবাহী নালির দুর্ঘটনাই হলো স্ট্রোক। এ দুর্ঘটনায় রক্তনালি বন্ধও হতে পারে, আবার ফেটে গিয়ে রক্তপাতও ঘটতে পারে। এর ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বিকল হয়ে যায়। ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশনের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বে প্রতি ২ সেকেন্ডে ১ জন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং প্রতি ৪ সেকেন্ডে ১ জন মৃত্যুবরণ করেন। স্ট্রোক দু'ধরনের-

১. রক্তনালি ছিঁড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। একে বলে হেমোরেজিক স্ট্রোক।

২. রক্তনালি ব্লক হয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্ত না যাওয়া এবং ঐ অংশ শুকিয়ে যাওয়া। একে বলে ইস্কেমিক স্ট্রোক।

স্ট্রোকের কারণ: অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, হাই-প্রেসার, হাই-কোলেস্টেরল, ধূমপান, পারিবারিক স্ট্রোকের ইতিহাস, হার্টের অসুখ যেমন- অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, রক্তজমাট বাঁধা অসুখ, ক্যান্সার ইত্যাদি আরও অনেক কারণ রয়েছে স্ট্রোকের। ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক কংগ্রেসে বলা হয়েছে, দশটা রিস্ক ফ্যাক্টর কারণ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ৯০ শতাংশ স্ট্রোক এড়ানো সম্ভব। হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ স্ট্রোকের প্রধান কারণ। শুধু উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করলে স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব ৫০ শতাংশ।

স্ট্রোক

উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে। অনেক রোগী উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক দেখে ওষুধ সেবন বন্ধ করে দেন। যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় চার গুণ বেশি।

ডায়াবেটিস রোগীদের খালি পেটে ব্লাড সুগার ১০০-১২০ মিলিগ্রামের নিচে এবং খাবার দুই ঘণ্টা পর ১৪০-১৬০ মিলিগ্রাম রাখা ভালো। ডায়াবেটিস রোগীদের স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় তিন গুণ বেশি, আর আক্রান্ত হলে মৃত্যুর ঝুঁকিও থাকে বেশি।

স্ট্রোকের লক্ষণ:

- ✓ শরীরের একদিকে দুর্বল বা অবশ হয়ে যাওয়া।
- ✓ কথা অস্পষ্ট, জড়িয়ে যাওয়া বা একেবারে বুঝতে ও বলতে না পারা।
- ✓ চোখে ঝাপসা দেখা, দুটি প্রতিবিম্ব দেখা বা একেবারেই না দেখা।
- ✓ হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম, ঘোরা, হতবিহ্বল হয়ে পড়া বা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা।
- ✓ মারাত্মক লক্ষণ হলো হঠাৎ তীব্র মাথা ব্যথা, বমি, খিঁচুনি বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলা।

স্ট্রোক

স্ট্রোক একটা প্রতিরোধযোগ্য রোগ। একবার আক্রান্ত হলে চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদি। তাই প্রতিরোধই উত্তম।

স্ট্রোক প্রতিরোধ: স্ট্রোক ঝুঁকি থেকে দূরে থাকতে ধূমপান, জর্দা, গুল, মাদক পরিহার করতে হবে। ধূমপান রক্তনালি সংকুচিত করে স্ট্রোক ঝুঁকি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পরও পাঁচ বছর পর্যন্ত ঝুঁকি থেকে যায়। নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস জীবনকে পরিবর্তন করে। স্ট্রোক প্রতিরোধের কার্যকরী পন্থা হলো নিয়মিত ব্যায়াম করা।

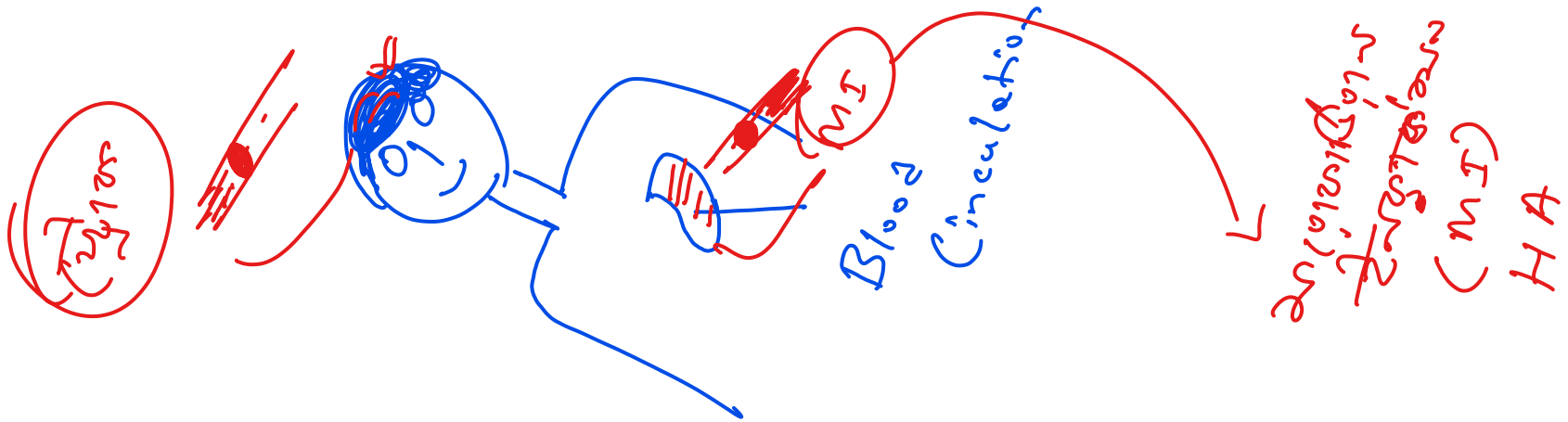

হার্ট অ্যাটাক

হার্ট অ্যাটাক

যখন হৃৎপিণ্ডের কোনো শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি করে তখনই হার্ট অ্যাটাক হয়। বয়স, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা, অতিরিক্ত মেদ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, মদ্যপান, মানসিক চাপ-এগুলি মূলত হার্ট অ্যাটাকের কারণ। অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক হলেও সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয় না। সমস্যা হল কখনও কখনও বুকে কোনো ধরনের ব্যথা ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, ফলে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা তা খুব ভাল করে বোঝা যায় না। হার্ট অ্যাটাকের অন্যান্য লক্ষণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- ✓ ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা।
- ✓ অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া।
- ✓ বদহজমের সমস্যা।
- ✓ বুকে চাপ ধরা ভারি ভাব অনুভব করা।
- ✓ পেটের উপরের অংশে ব্যথা।

হার্ট অ্যাটাক

Coronary by Pass

মানবদেহে তিনটি বড় ধমনিসহ আরো কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধমনি দ্বারা হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। যদি কোনো কারণে দুটি বা তিনটি বৃহৎ ধমনি দ্বারাই রক্তপ্রবাহ আংশিক বন্ধ হয়ে যায় তবে সাধারণত যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় থাকে Coronary by Pass বলে। ধমনি সংকুচিত হলে বা চর্বি জমে বা জমাট রক্তে পূর্ণ হলে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় শরীরের অন্য স্থান থেকে শিরা কেটে এনে বাঁধাপ্রাপ্ত স্থানের উপর থেকে নিচে জোড়া লাগানো হয়। এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি।

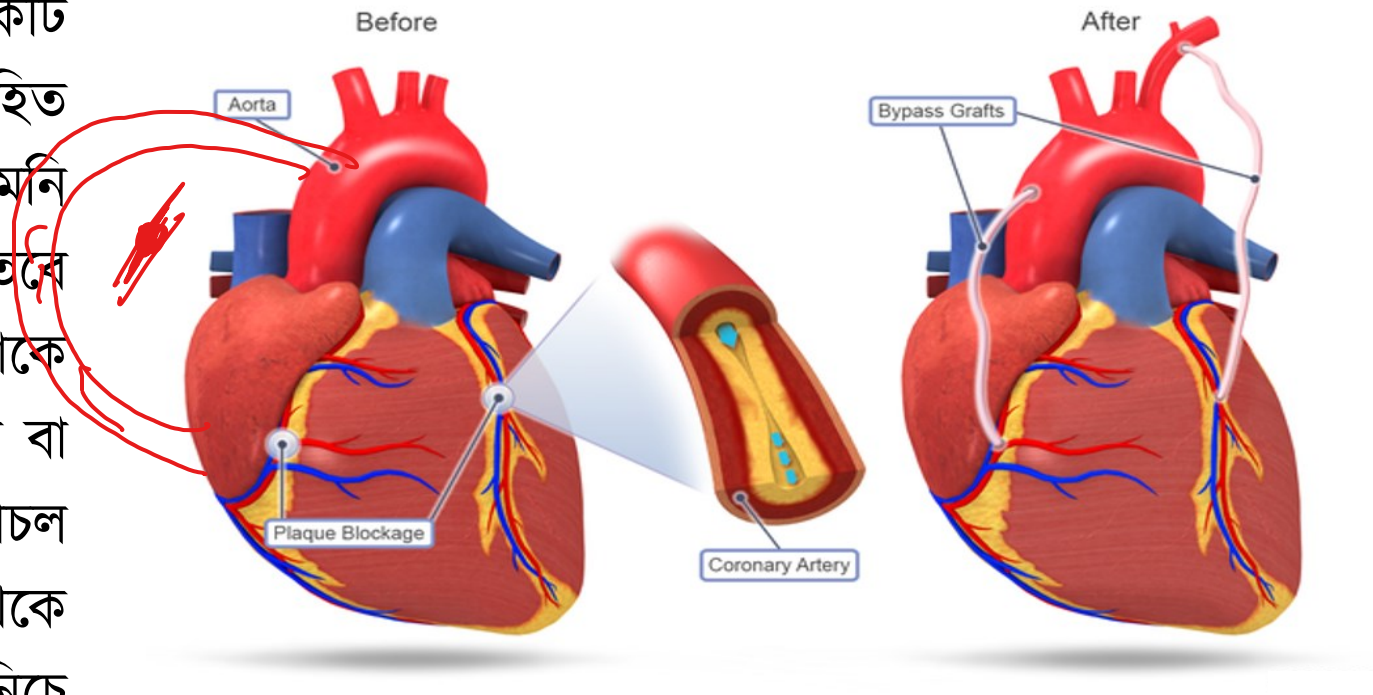

হার্ট অ্যাটাক

Angioplasty

মানবদেহের তিনটি বড় ধমনির মধ্যে যে কোন একটি ধমনি দ্বারা রক্ত চলাচল বাঁধাপ্রাপ্ত হলে যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করানো হয় তাকে Angioplasty বলে। এ পদ্ধতিটি Coronary by Pass অপেক্ষা সহজ পদ্ধতিতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রের দ্বারা সংকুচিত ধমনির স্থান বিশেষকে বেলুনের দ্বারা প্রসারিত করা হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে। এটি স্থায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি।

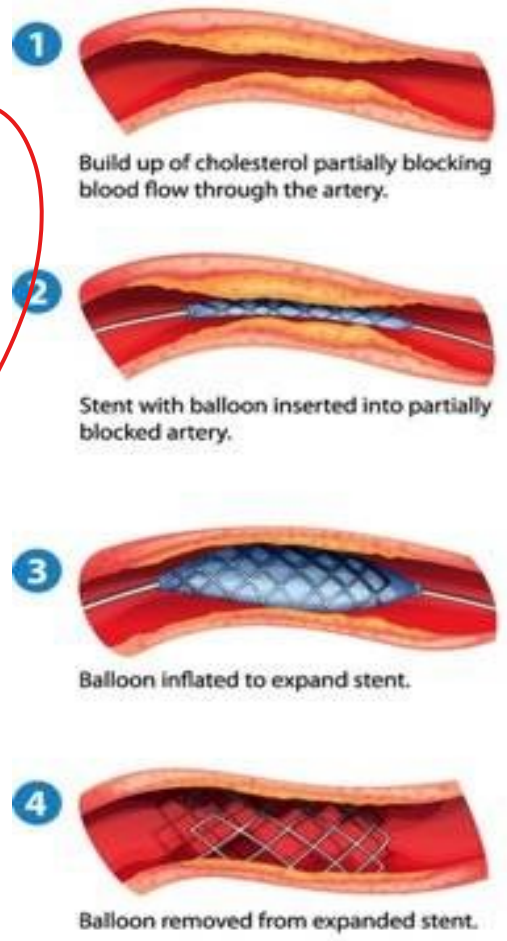

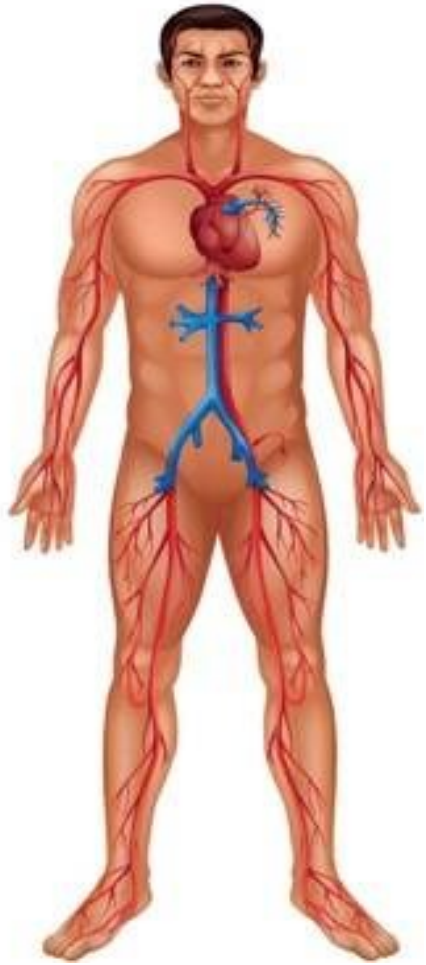

রক্তচাপ

OBSERVATION	SYSTOLIC	DIASTOLIC
NORMAL	90—129	60—79
STAGE 1	130—139	80—89
STAGE 2	140—179	90—109
CRITICAL	OVER 180	OVER 110

রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপ

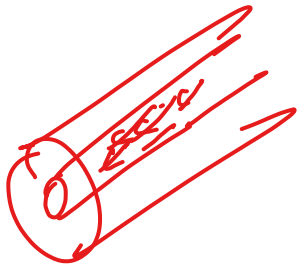

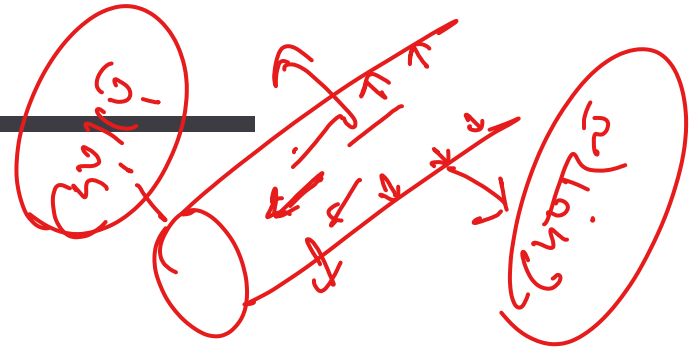

- **ঝুঁকি:** শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ওপর স্বল্প থেকে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে এই উচ্চ রক্তচাপ। বিশেষত স্ট্রোক, হৃদক্রিয়া বন্ধ, চোখের ক্ষতি এবং বৃক্ক বা কিডনি বিকলতা ইত্যাদি রোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।
- **কারণ:** অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ, অতিরিক্ত মেদ, কাজের চাপ বা টেনশন, মদ্যপান, অতিরিক্ত আওয়াজ, ঘিঞ্জি পরিবেশ ইত্যাদি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। আবার এটি বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত একটি অসুখও। প্রায় ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার কারণ হিসেবে লবণের ব্যবহারকে দায়ী করা হয়।
- **করণীয়:** চিকিৎসকরা মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের রক্তচাপের জন্য ওজন কমানো, ধূমপান ছেড়ে দেওয়া এবং নিয়মিত হালকা ব্যায়ামকে চিকিৎসার প্রথম ধাপ হিসেবে ধরেন। যদিও ধূমপান ছেড়ে দেওয়ায় সরাসরি রক্তচাপ কমে না; কিন্তু উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে এটি সম্পৃক্ত, কারণ এটি ছেড়ে দিলে উচ্চ রক্তচাপের বেশ কিছু উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে আসে। যেমন- স্ট্রোক অথবা হার্ট অ্যাটাক। মৃদু উচ্চ রক্তচাপ সাধারণত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম এবং শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সারিয়ে তোলা যায়। ফল, শাকসবজি, স্নেহবিহীন দুগ্ধজাত খাদ্য এবং নিম্নমাত্রার লবণ ও তেলজাতীয় খাদ্য উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া পরিবেশগত চাপ যেমন উঁচু মাত্রার শব্দের পরিবেশ বা অতিরিক্ত আলো পরিহার করাও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপকারী।

হৃদরোগ

হৃদরোগের কারণ: আমাদের হৃৎপিণ্ডে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা হৃদযন্ত্রে আসে ধমনি দিয়ে। সেটি যখন সরু হয়ে যায়, তখন নালীর ভেতরে রক্ত জমাট বেধে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে হৃদযন্ত্রের পেশিগুলো দুর্বল হয়ে যায়, ফলে আর সে অক্সিজেন প্রবাহিত করতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে অক্সিজেন প্রবাহিত না হতে পারলেই হার্ট অ্যাটাক হয়।

প্রতিরোধ:

- ✓ খাবার ও জীবনযাপনে পরিবর্তন আনতে হবে, নিয়মিত হাঁটা-চলা ও ব্যায়াম করতে হবে, সক্রিয় থাকতে হবে।
- ✓ ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- ✓ নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে।
- ✓ ধূমপান বন্ধ করতে হবে।
- ✓ মাঝে মাঝে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস

আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন এর তথ্যমতে, ডায়াবেটিস এমনই একটি রোগ, যা কখনো সারে না। কিন্তু এই রোগকে সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আইরিশ ইনডিপেনডেন্টের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, যখন আমরা কার্বোহাইড্রেট বা সাধারণ শর্করাজাতীয় খাবার খাই, তখন তা ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয়। ইনসুলিন হচ্ছে একধরনের হরমোন। এর কাজ হলো এই গ্লুকোজকে মানুষের দেহের কোষগুলোয় পৌঁছে দেওয়া। এরপর সেই গ্লুকোজ ব্যবহার করে শরীরের কোষগুলো শক্তি উৎপাদন করে। সেই শক্তি দিয়েই রোজকারের কাজকর্ম করে মানুষ। সুতরাং যখন এই গ্লুকোজ শরীরের কোষে পৌঁছাবে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৈনন্দিন কাজ ব্যাহত হবে।

যখন কারও ডায়াবেটিস হয়, তখন তার শরীরে ইনসুলিন হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে দেহের কোষে গ্লুকোজ পৌঁছাতে পারে না। এতে করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। সাধারণত প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত গ্লুকোজ শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এই কারণে ডায়াবেটিস রোগীর ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। যখন প্রস্রাব বেশি হয়, তখন ডায়াবেটিসে ভোগা রোগী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন।

অন্যদিকে, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়ার রোগীর শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ গ্লুকোজ বের হয়ে যায়। এতে করে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করতে পারে না দেহের কোষগুলো। ফলে রোগী দুর্বলতা অনুভব করেন। রোগী যদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে তার রক্তনালী, স্নায়ু, কিডনি, চোখ ও হৃদযন্ত্রের সমস্যাসহ নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিসের লক্ষণ:

- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া।
- তৃষ্ণা পাওয়া।
- নিয়মিত খাওয়ার পরও ঘন ঘন খিদে।
- প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত অনুভব করা।
- চোখে ঝাপসা দেখা।
- শরীরের বিভিন্ন অংশের কাটাছেঁড়া সহজে সারে না।
- খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া।
- হাতে-পায়ে ব্যথা বা মাঝে মাঝে অবশ হয়ে যাওয়া।

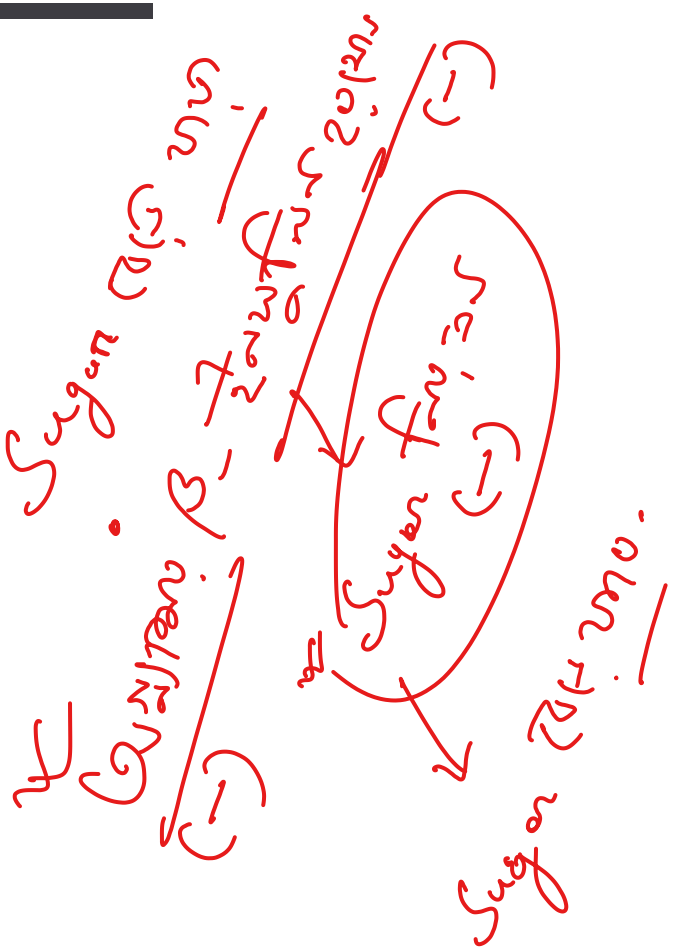

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিসের প্রকারভেদ:

- টাইপ-১
- টাইপ ২-

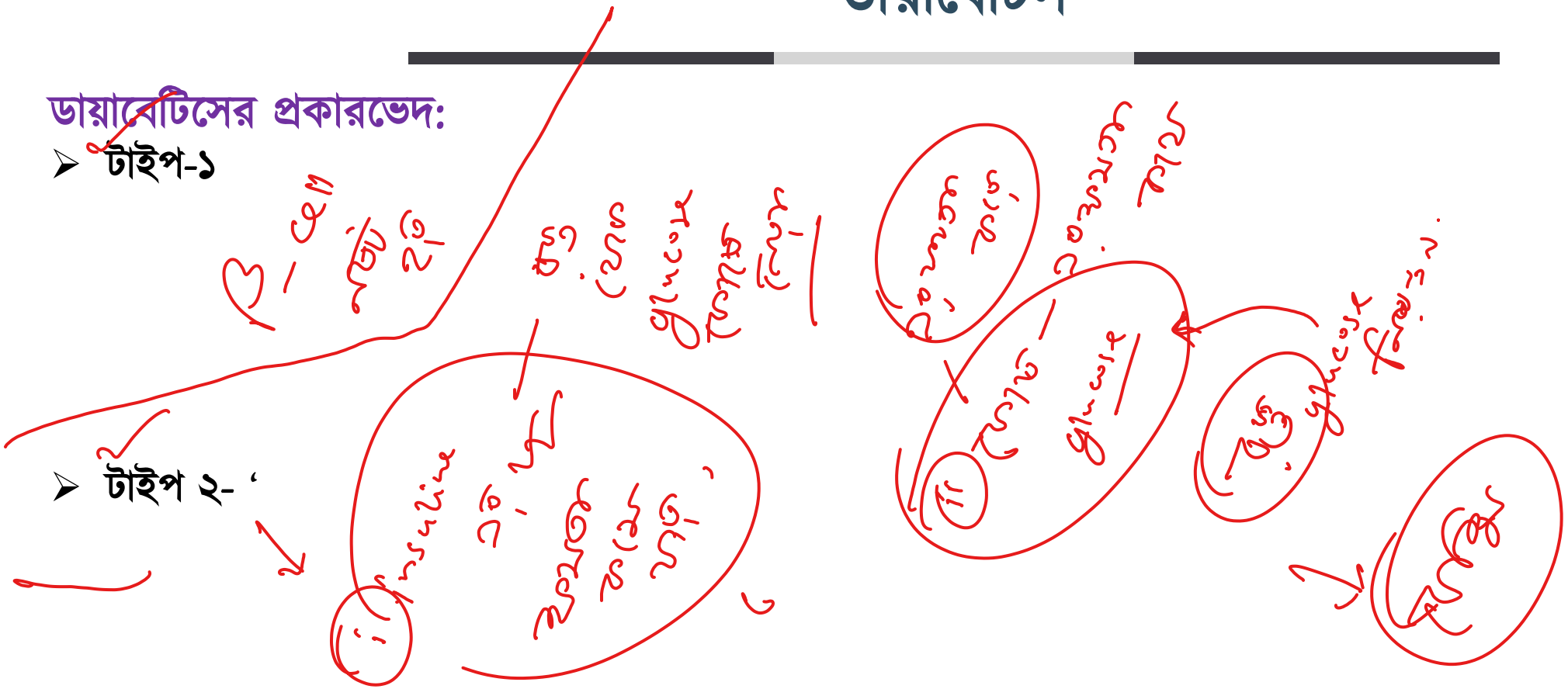

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস-এ আক্রান্ত হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ-

- পিতা মাতা বা পরিবারের কেউ বা রক্তসম্পর্কিত কারোর যদি থাকে।
- কারোর ওজন বেশি থাকলে।
- কারোর যদি উচ্চ রক্তচাপ বা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকে।
- এছাড়া জেনেটিক কোনো কারণে ইনসুলিন যদি কমে যায়।
- অন্যান্য হরমোন ঘটিত কারণে।
- স্টেরওয়েড জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের কারণে।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্য তালিকা

- চিনি বা মিষ্টি পরিত্যাগ করতে হবে।
- কার্বহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার না খাওয়া।
- ক্যালরিযুক্ত খাবার পরিমাণ মত খাওয়া।
- নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, অনিয়ম না করা।
- অভুক্ত না থাকা, অল্প অল্প করে বারবার খাওয়া।
- তেতো জাতীয় খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়া।
- ধূমপান পরিত্যাগ করা।
- ফাস্টফুড পরিত্যাগ করা।

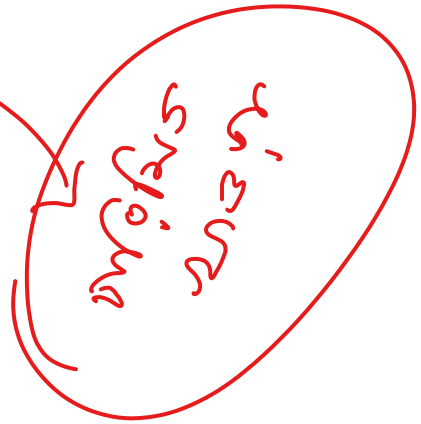

ডায়াবেটিস

ইনসুলিন

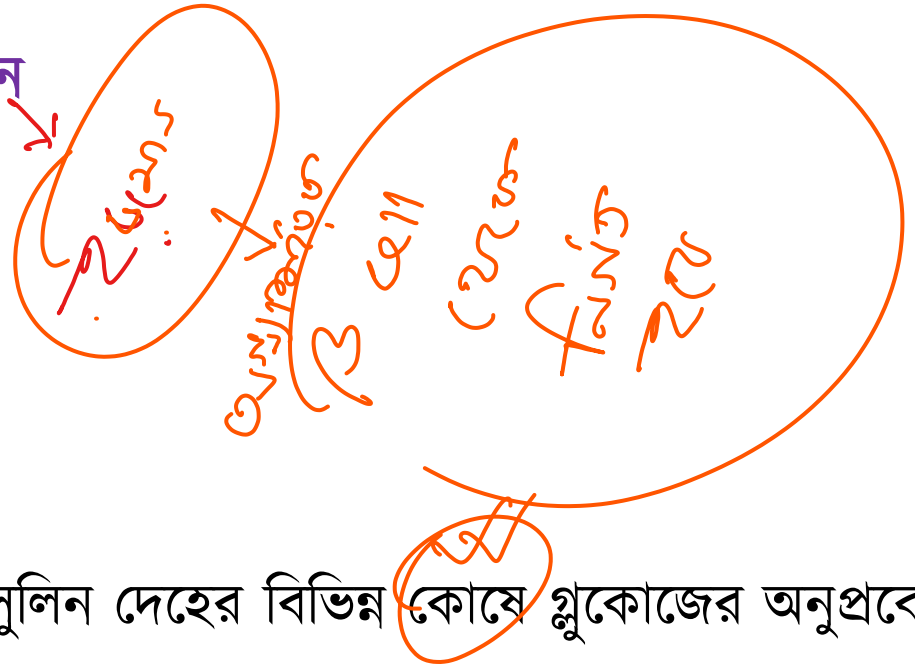

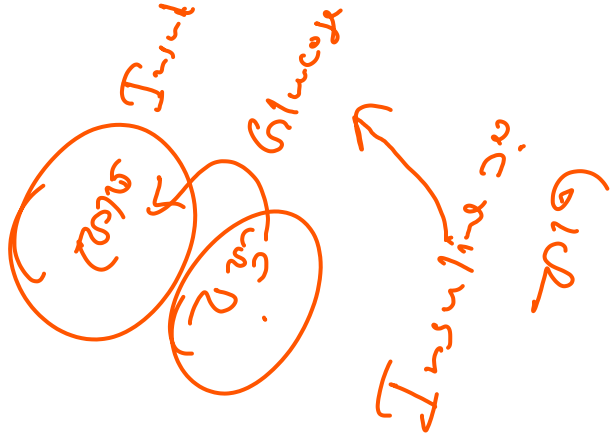

কাজ

- ইনসুলিন দেহের বিভিন্ন কোষে গ্লুকোজের অনুপ্রবেশ ঘটায়।
- গ্লুকোজের জারণ বৃদ্ধি করে।
- গ্লাইকোজেনকে সংশ্লেষিত করে।
- রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তের চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ডেঙ্গু

ডেঙ্গু

ডেঙ্গু জ্বরের উৎপত্তি RNA ভাইরাস ডেঙ্গু বা ডেঙ্গি থেকে। Aedes Aegypti নামক মশা এই ভাইরাসের বাহক ও সংক্রামক। এই মশার কামড়ের মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাস মানুষের রক্তে প্রবেশ করে অণুচক্রিকার সাথে যুক্ত হয়ে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। আক্রান্ত অনুচক্রিকা সুস্থ অনুচক্রিকাকে আক্রমণ করে এবং নষ্ট করে দেয়। ফলে রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ হ্রাস পায়। এভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ালে সেই মশাও ভাইরাসের বাহকে পরিণত হয় এবং রোগ সংক্রামণে সহায়তা করে।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ

ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বরে সাধারণত তীব্র জ্বর ও শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা, হাড়, কোমড়, অস্থিসহ মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। হেমোরোজিক জ্বরের ক্ষেত্রে চামড়ার নিচে রক্ত জমে, নাক ও মাড়ি দিয়ে এবং বমি ও পায়খানার সাথে রক্ত পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে কিডনি ফেইলিউর পর্যন্ত হতে পারে।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া জ্বরের মধ্যে পার্থক্য

ডেঙ্গু	চিকুনগুনিয়া
➢ ডেঙ্গু জ্বরে শরীরে কাঁপুনি, ঘাম ও তীব্র অবস্থায় রক্তক্ষরণ হয়।	➢ চিকুনগুনিয়া জ্বরে সাধারণত এগুলো হয় না।
➢ মাংসপেশিতে ব্যথা হলে ডেঙ্গু জ্বর হওয়ার আশঙ্কা বেশি।	➢ হাতের আঙুলের জয়েন্টে, পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা হলে চিকুনগুনিয়া হওয়ার আশঙ্কা বেশি।
➢ ডেঙ্গু হলে পুরো শরীরে র‍্যাশ হয়।	➢ চিকুনগুনিয়ায় হাত-পা ও মুখমণ্ডলে র‍্যাশ হয়।
➢ ডেঙ্গু জ্বরে রক্তের অণুচক্রিকার সংখ্যা অনেক কমে যায়।	➢ চিকুনগুনিয়ায় রক্তের অণুচক্রিকার সংখ্যা ততটা কমে না।
➢ ডেঙ্গু জ্বরে অস্থিসন্ধির ব্যথা জ্বর কমে যাওয়ার পর কমে যায়।	➢ চিকুনগুনিয়া জ্বরে অস্থিসন্ধির ব্যথা জ্বর কমে যাওয়ার পরও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। চিকুনগুনিয়া জ্বর ভালো হলেও রোগটি অনেক দিন ধরে রোগীদের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
➢ একই মশা দিয়ে চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু জ্বর হলেও ডেঙ্গুতে মৃত্যু ঝুঁকি হয়।	➢ চিকুনগুনিয়া হলে কারো মৃত্যু হয় না।

ডেঙ্গু

প্রতিরোধ

যেহেতু ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া মশাবাহিত রোগ, তাই মশার বংশ বৃদ্ধিরোধ, নিধন ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডেঙ্গুজ্বর ভাইরাস গঠিত রোগ। অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ শুধুমাত্র ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর হয় না। আর এই মশা সাধারণত পরিষ্কার পানিতে বংশ বৃদ্ধি করে। আর তাই ঘরবাড়ি ও এর চারপাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ক্যান, টিনের কৌটা, মাটির পাত্র, বোতল, নারকেলের মালা ও এ-জাতীয় পানি ধারণ করতে পারে। সুতরাং এমন পাত্র ধ্বংস করে ফেলতে হবে, যেন পানি জমতে না পারে। গোসলখানায় বালতি, ড্রাম, প্লাস্টিক ও সিমেন্টের ট্যাঙ্ক কিংবা মাটির গর্তে চার-পাঁচ দিনের বেশি কোনো অবস্থাতেই পানি জমিয়ে রাখা যাবে না। পরিষ্কার ও স্থবির পানিতে ডেঙ্গুর জীবাণু বেশি জন্মায়। ঘরের আঙিনা, ফুলের টব, বারান্দা, বাথরুম, ফ্রিজের নিচে ও এসির নিচে জমানো পানি নিয়মিত পরিষ্কার করা, যাতে মশা বংশবৃদ্ধি করতে না পারে।

ডায়রিয়া

ডায়রিয়া

সংক্রামক ডায়রিয়ার কারণ:

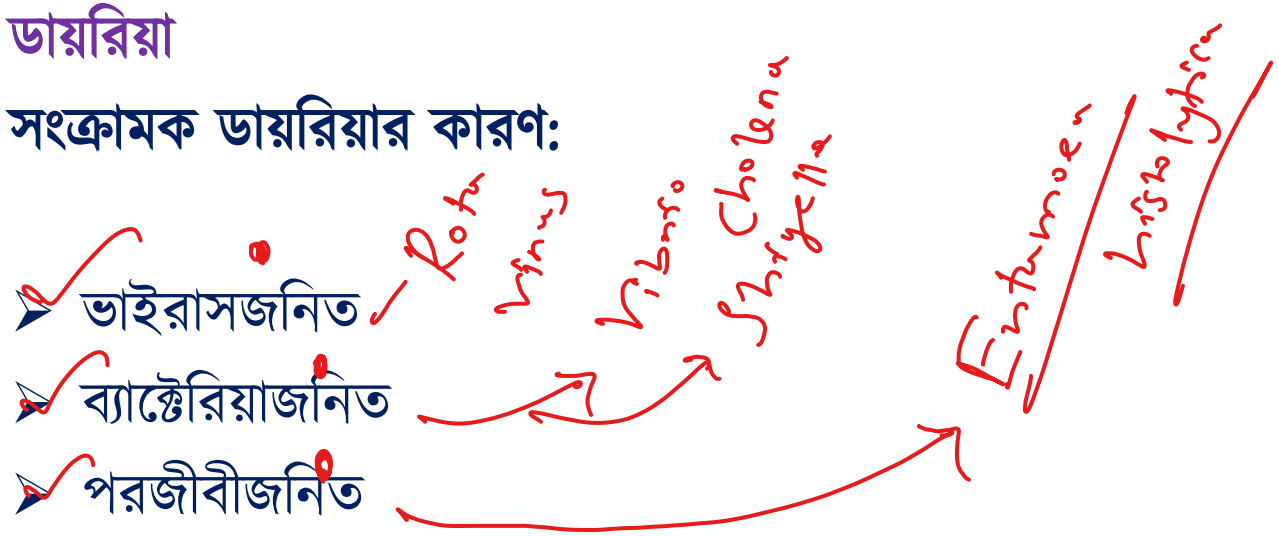

চিকিৎসা ব্যবস্থা: তীব্র ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে, তীব্র এবং সম্ভাব্য সংক্রামক ডায়রিয়ার সব রোগীকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে, যাতে পরিবারের অন্য কারো মধ্যে এটা ছড়াতে না পারে। তীব্র ডায়রিয়ার চিকিৎসায় প্রধানত তিনটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যথা: ১. তরল প্রতিস্থাপন, ২. অ্যান্টিবায়োটিক অথবা জীবাণু বিরোধী ওষুধ, ৩. ডায়রিয়া বিরোধী ওষুধ।

ডায়রিয়া

- **তরল প্রতিস্থাপন:** ডায়রিয়ার চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য হলো পানির ঘাটতি পূরণ করা এবং পুনরায় যাতে পানিশূন্যতার সৃষ্টি না হয়, সে ব্যবস্থা করা। এ সামান্য ও মাঝারি ধরনের পানিশূন্যতার ক্ষেত্রে খাবার স্যালাইনের মাধ্যমে পানিশূন্যতা পূরণ করা সম্ভব। রোগীর যতবার পাতলা পায়খানা হবে, ততবার রোগীকে খাবার স্যালাইন খেতে হবে। খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি রোগীকে অন্যান্য তরল ও পানীয় খেতে দিতে হবে। মারাত্মক পানিশূন্যতার ক্ষেত্রে রোগীকে শিরাপথে স্যালাইন দিতে হবে।

- **অ্যান্টিবায়োটিক/জীবাণুবিরোধী ওষুধ:** ডায়রিয়ার চিকিৎসায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগী তরল ও ইলেকট্রোলাইট প্রতিস্থাপনে ভালো হয়ে যায়, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। তবে কলেরা সন্দেহ হলে, জ্বর থাকলে কিংবা পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে পায়খানা পরীক্ষা করে সঠিক জীবাণু নির্ণয় করে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা ভালো।

ডায়রিয়া

- **ডায়রিয়া বিরোধী ওষুধ:** ডায়রিয়া বিরোধী ওষুধ ব্যবহারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সংক্রমিত পাক-আন্ত্রিক প্রদাহ থাকলে এসব ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে অথবা শিশুদের আমাশয়ের ক্ষেত্রে এসব ওষুধ ব্যবহার করলে ক্ষতি হতে পারে।

প্রতিরোধ: ডায়রিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সচেতনতাই প্রধান। ডায়রিয়া রোগের সঙ্গে ঘনবসতি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সম্পর্ক রয়েছে। দূষিত খাবার ও পানির মাধ্যমে ডায়রিয়া ছড়ায়। মাছি ডায়রিয়ার জীবাণু ছড়াতে সাহায্য করে। তাই এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকলে এবং সঠিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চললে ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব।

DRUG ADDICTION

মাদক

ক্রিস্টাল মেথ, এল.এস.ডি, হিরোইন, কোকেন, ইয়াবা, আফিম, মারিজুয়ানা, গাজা, ফেনসিডিল, বিয়ার, কেটামিন, বিভিন্ন রকমের ঘুমের ওষুধ থেকে শুরু করে জুতায় লাগানোর আঠা পর্যন্ত।

মাদকাসক্তির লক্ষণ: মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। সাধারণত তিনটি কারণকে মাদকাসক্তির মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়: ১. হতাশা, ২. নেশার প্রতি কৌতূহল ও প্রবল আগ্রহ, ৩. কুসঙ্গ।

মাদক দেহে ও মস্তিষ্কে কীভাবে কাজ করে: দীর্ঘদিন মাদক ব্যবহারকারীদের ডোপামিন এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে মস্তিষ্কের যে সমস্ত জায়গা ডোপামিন এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে সেই জায়গাগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মাদক গ্রহণের পরিমাণের ভিন্নতার কারণে দেহে ও মস্তিষ্কে এর প্রভাব ভিন্ন হয়। খুব অল্প পরিমাণে মাদক উদ্দীপক বস্তু হিসেবে কাজ করে। বেশি পরিমাণে মাদক গ্রহণ করা হলে তা যন্ত্রণাদায়ক হিসেবে কাজ করে। বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা হলে শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে যার পরিণতি হয় মৃত্যু। কিছু কিছু মাদক দ্রব্য সরাসরি মনকে আক্রমণ করে। এতে করে মাদক গ্রহণকারী তার চারপাশে কি ঘটছে তার উপলব্ধি হারিয়ে ফেলে। মাদক একজন ব্যক্তির সকল ইন্দ্রিয় চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। যার ফলে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারে না। তার চিন্তাধারা নেতিবাচক হয়ে পড়ে।

DRUG ADDICTION

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে পরিবার। কেননা প্রতিটি পরিবারই মানুষের প্রথম পাঠাগার তাই প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ এতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বারবার সজাগ এবং সু-শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে এ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলতে পারে মাদকের ভয়ংকর ভূমিকা সম্পর্কে। এ ব্যাপারে প্রতি মাসে সেমিনার সেম্পোজিয়াম বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমেও সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। একটি সচেতন সমাজও সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজের ব্যক্তিবর্গরা সচেতন হলে, সমাজের কোনো ব্যক্তিই মাদক গ্রহণ করতে পারে না। তবে এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন হবে। ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি মাদক গ্রহণে সবসময় নিরুৎসাহিত করে, তাই ধর্মীয় মূল্যবোধ ভূমিকা রাখতে পারে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক মসজিদে জুম্মার দিনে মাদক বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। এছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। গণমানুষের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি করতে পত্রিকা, টেলিভিশন এবং অনলাইন সংবাদ মাধ্যমসমূহ ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

চোখের ছানি

চোখের ছানি রোগ

ছানিরোগের কারণ:

- ✓ বার্ধক্যজনিত কারণে লেন্সের গঠনগত পরিবর্তন।
- ✓ চোখে আঘাত, চোখে ঘন ঘন প্রদাহ।
- ✓ অপুষ্টি, অনিয়ন্ত্রিত স্টেরয়েড বা হরমোন থেরাপি।
- ✓ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস।
- ✓ পারিবারিক ইতিহাস ইত্যাদি।

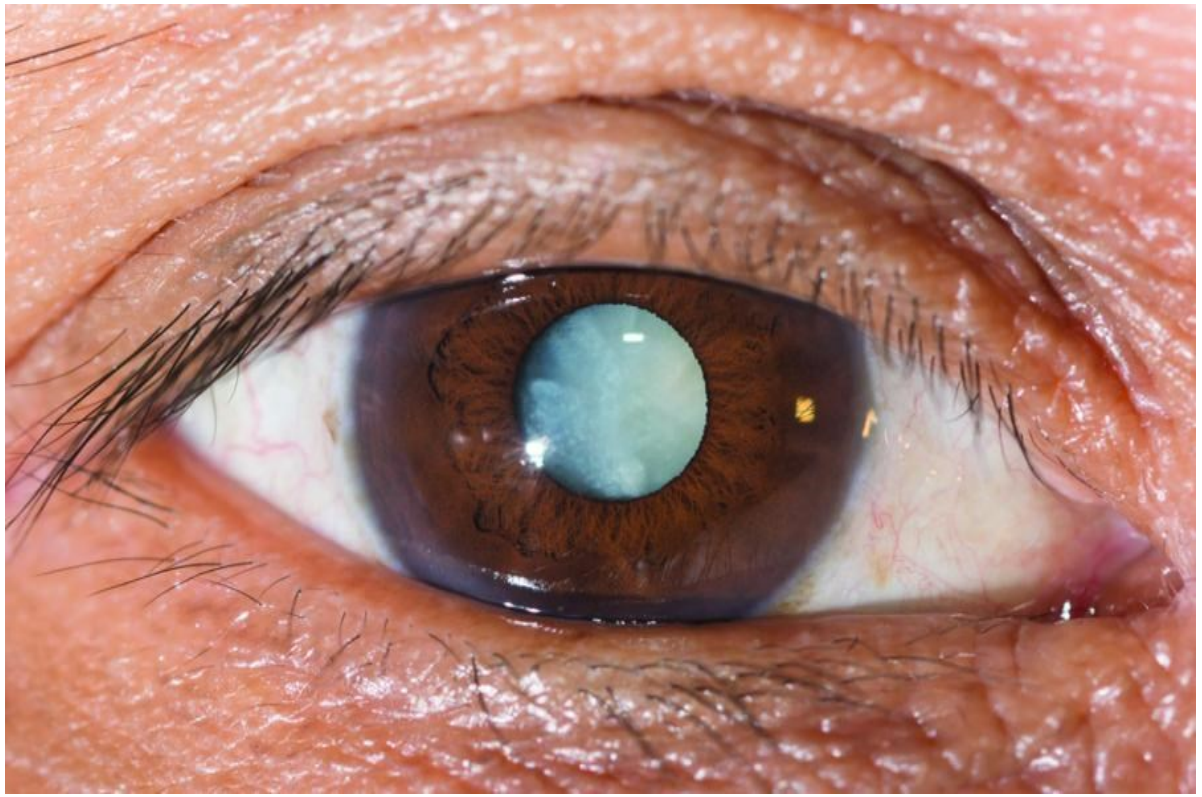

খাদ্যে বিষক্রিয়া

খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ:

- ✓ খাদ্য ভালভাবে রান্না না করা বিশেষ করে পোল্ট্রি বা বিভিন্ন ধরনের মাংস ভালভাবে সিদ্ধ করা না হলে।
- ✓ খাবার তৈরি বা পরিবহন বা সরবরাহের সময় হাত ভাল করে না ধুলে।
- ✓ রান্না করা খাবার দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করলে কিংবা রেফ্রিজারেটরে রাখলে।
- ✓ পচনশীল খাবার নির্ধারিত তারিখের পরও ব্যবহার করলে।
- ✓ অসুস্থ কারো স্পর্শ করা খাবার খেলে। এছাড়া এমন কোন ব্যক্তির স্পর্শ করা খাবার খেলে যে অসুস্থ কারো সংস্পর্শে গিয়েছিল।

খাদ্যে বিষক্রিয়া

খাদ্যে বিষক্রিয়া রোধে করণীয়:

- ✓ খাবার স্পর্শ করার আগে, টয়লেট থেকে ফিরে, পোষা প্রাণীকে ধরার পর কিংবা ময়লা ফেলার পর গরম পানি এবং সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
- ✓ সব সময় কাঁচা এবং রেডি-টু-ইট বা কিনেই খাওয়া যায় এমন খাবার আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ✓ প্যাকেটে নির্ধারিত তারিখ শেষ হওয়ার আগেই খাবার খেয়ে ফেলতে হবে।
- ✓ খাবার নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। এটা সাধারণত ফ্রিজে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। একবার রান্না করার পর বা প্যাকেট খোলার পর নির্ধারিত সময়েই (সাধারণত ২ দিন) তা খেয়ে শেষ করতে হবে।
- ✓ যে স্থানে খাবার রান্না ও প্রস্তুত করা হয় সেই স্থানটি নিয়মিত গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। বিশেষ করে মাংস রান্না করার পর এটি অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত।
- ✓ খাবার রান্না করার সময় পোষা প্রাণী রান্না ঘরের বাইরে রাখতে হবে। রান্না ঘরে ঢুকে গেলেও প্রয়োজনমতো সেটি পরিষ্কার করতে হবে।

চোখের ত্রুটি

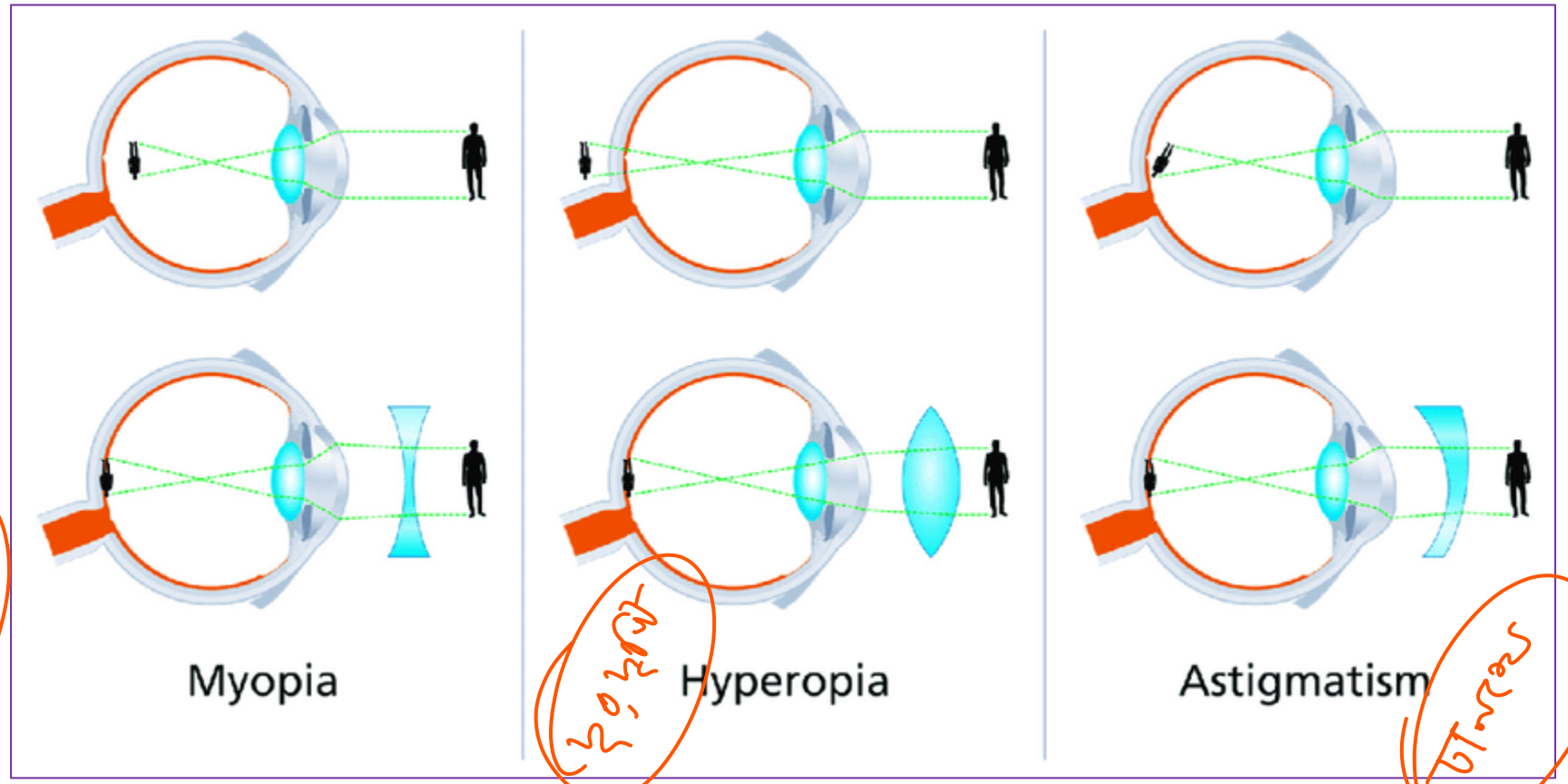

এক্স-রে (X-RAY)

এক্স-রে (X-ray)

- **এক্স-রে ইমেজিং:** এক্স-রের বিভিন্ন ধাতুর প্রতিভেদ্য ক্ষমতার কারণে বিভিন্ন পরীক্ষার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। যেকোনো গাঁথুনিতে ফাটল কিংবা অসামঞ্জস্যতা নির্ণয়ে এক্স-রে ইমেজিং গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয়। রেডিয়েশনের প্রভাবে সহজেই যেকোনো গঠনের সূক্ষ্ম ফাটল কিংবা অসামঞ্জস্যতা ফিল্ম বা ডিটেক্টরে স্পষ্ট ছবি তৈরি করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রে এই পদ্ধতিতেই যুগের পর যুগ রোগ নির্ণয় করে আসছে। এছাড়া এক্স-রে যাত্রাপথের নিরাপত্তার কাজেও ব্যাপক জনপ্রিয়। কার্গো, লাগেজ কিংবা স্বয়ং যাত্রীর শরীরে ইলেকট্রনিক ইমেজিং এর ম্যাধমে রিয়েল টাইম ভিজুয়াল তৈরি করে যার ফলে তৎক্ষণাৎ অবৈধ বস্তুর সন্ধান পাওয়া সম্ভব। তবে এক্স-রে ইমেজিংয়ের সবচেয়ে বড় ব্যবহার দেখা যায় চিকিৎসাক্ষেত্রে। শরীরের টিস্যুর মাঝ থেকে হাড়ের কিংবা অভ্যন্তরীণ গঠনের ইমেজিং এর মাধ্যমে এক্স-রে চিকিৎসকদের রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে।
- **এক্স-রে থেরাপি:** সাধারণ রেডিয়েশন থেরাপি ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের DNA ভাঙ্গনের মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। তবে এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সুস্থ কোষের DNA ধ্বংস হবার সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমেরিকান পরিবেশ প্রতিরক্ষা সংস্থার মতে, এক্স-রে যে কোনো নির্দিষ্ট একটি অংশের অণু পরমাণু থেকে সকল ইলেকট্রন সফলভাবে সরিয়ে নিতে সক্ষম। পর্যাপ্ত ব্যবহারের মাধ্যমে এটি মানবশরীরের যে কোনো কোষকেও ধ্বংস করতে সক্ষম। যদিও এক্স-রের ব্যবহারে ক্যান্সার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, একইসাথে ক্যান্সারের প্রতিরোধেও এক্স-রে দারুণ কার্যকরী। ক্যান্সার টিউমারে এক্স-রে নিক্ষেপণের মাধ্যমে ক্যান্সারের অস্বাভাবিক কোষ সহজে ধ্বংস করা সম্ভব।

আল্ট্রাসোনোগ্রাফি

আল্ট্রাসোনোগ্রাফি

আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবহার:

- **গর্ভাবস্থা:** আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে বাচ্চা ডেলিভারির তারিখ থেকে শুরু করে বাচ্চার গঠন-প্রকৃতি, লিঙ্গ, মায়ের সম্ভাব্য কোন অসংগতি যা বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর, মায়ের পেটের ভিতর বাচ্চার অবস্থান, বাচ্চার নড়াচড়া, জমজ বাচ্চাসহ বিভিন্ন বিষয় জানা যায়। গর্ভকালীন যেকোনো ইমার্জেন্সিতে আল্ট্রাসনোগ্রাফি একজন চিকিৎসকের জন্য সর্বোত্তম নির্ভরযোগ্য ডাক্তারি পরীক্ষা পদ্ধতি। আল্ট্রাসনোগ্রাফির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অন্যান্য রেডিওলোজিকাল পরীক্ষার তুলনায় কম বলে এটা বেশ নিরাপদ।
- **রোগ নির্ণয়:** আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন- লিভার, স্প্লিন বা প্লিহা, কিডনি, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী, পিত্তথলি, চক্ষু, থাইরয়েড, মূত্রথলীসহ নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গের নানাবিধ রোগ সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব।
- **বায়োপসি ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে:** বায়োপসি ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আল্ট্রাসনোগ্রাফি ব্যবহার করা যায়। যেমন- শরীরের কোন অঙ্গের পাথর নিরাময়ের জন্যও আল্ট্রাসনোগ্রাফি বহুল ব্যবহৃত হয়।
- **রক্তনালীর গতিপথ ও প্রবাহ নির্ণয়:** বর্তমানে আল্ট্রাসনোগ্রাফির আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হল রক্তনালীর গতিপথ ও প্রবাহ নির্ণয় করা। এতে করে আমাদের রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার রোগও ডায়াগনোসিস করা সম্ভব।
- **ইকোকার্ডিওগ্রাম:** হৃৎপিণ্ডের গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্য যে ইকো করা হয় তা মূলত আল্ট্রাসনোগ্রাফিরই অন্য আরেকটি ব্যবহার।

আল্ট্রাসোনোগ্রাফি

রোগ নির্ণয়ে আল্ট্রাসনোগ্রাফির গুরুত্ব:

- ✓ স্নায়ুর অতি কাছে যখন ইনজেকশনের মাধ্যমে অ্যানেসথেসিয়া বা অবচেতনকারী প্রয়োগ করা হয় তখন গাইড হিসেবে অনেক সময় আল্ট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করতে হয়।
- ✓ হৃদরোগ নির্ণয়ে আল্ট্রাসনোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। বহুল প্রচলিত ইকোকার্ডিওগ্রাম আসলে আল্ট্রাসনোগ্রাম। কালার ডপলারের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহ ও হার্টের টিস্যুর অবস্থা অত্যন্ত ভালোভাবে বোঝা সম্ভব। এর মাধ্যমে হার্টের ভাল্ভ কতখানি কর্মক্ষম আছে, কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কি না, ভালভুলার রিগারজিটেশন আছে কি না, হার্ট ঠিকমতো রক্ত পাম্প করতে পারছে কি না ইত্যাদিও জানা যায়। আবার রক্তনালি ব্লকড বা সরু হলে আর্টারিয়াল আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। ভেনাস আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস পর্যালোচনা করা যায়।
- ✓ ইমার্জেন্সি মেডিসিনে আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবহার এখন খুব বেড়েছে, যার মাধ্যমে দ্রুত আঘাতের পরিমাণ ও বিস্তৃতি, পেরিকার্ডিয়াল টেমপোনেড, হেমোপেরিটোনিয়ামের মতো জরুরি অবস্থা নির্ণয় করে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া যায়। আর গলব্লাডার বা অ্যাপেন্ডিক্সের মতো হঠাৎ ব্যথা হয় এমন অসুখও নির্ণয়ে ইমার্জেন্সিতে আল্ট্রাসনোগ্রাম করতে হয়।

আল্ট্রাসোনোগ্রাফি

- ✓ পরিপাকতন্ত্র বা পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম বহু কারণেই করতে হয়। মূলত পেটের আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমেই কিডনি, লিভার, স্প্লিন, গলব্লাডার, প্যানক্রিয়াজ বা অগ্ন্যাশয়, পেটের টিউমার ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়।
- ✓ নবজাতকের মাথার ওপরের দিকের নরম অংশ স্ক্যান করে তার মস্তিষ্কে কোনো গঠনগত অসংগতি, হাইড্রোক্যাফালাস, পেরিভেন্ট্রিকুলার লিউকোম্যালাসিয়া ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। পরে এ নরম অংশ ক্রমেই শক্ত হাড়ে পরিণত হয়ে গেলে আর আল্ট্রাসনোগ্রাম করে মস্তিষ্ক পরীক্ষা করা যায় না।
- ✓ প্রসূতিবিদ্যায় বহু ক্ষেত্রে আল্ট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করতে হয়। এমনকি গর্ভধারণের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায়ও অনেক সময়ই গর্ভধারণ নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা হিসেবেও এটি করা হয়। জন্মানোর আগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে দেখা হয় অনাগত শিশুর সুস্থতাও। ডপলার সনোগ্রাফির মাধ্যমে শিশুর হৃদস্পন্দন বোঝা যায়। এতে শিশুর জন্মগত কোনো হার্টের অসুখ থাকলে তা আগে থেকেই জানা যায়।
- ✓ ইউরোলজির বহু রোগ নির্ণয় সহজ হয়েছে আল্ট্রাসনোগ্রামের ব্যবহারের কারণে। যেমন- প্রস্রাবের পর কতখানি প্রস্রাব থলিতে আটকে আছে, তা জানতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা এটি। আবার প্রজননতন্ত্র, বিশেষ করে জরায়ু ও শুক্রথলির রোগ নির্ণয়েও আল্ট্রাসনোগ্রাম জরুরি। টেস্টিকুলার ক্যান্সার, হাইড্রোসিলি বা ভেরিকোসিলির পার্থক্য বুঝতেও এ পরীক্ষা কাজে লাগে।
- ✓ হাড়ের আল্ট্রাসনোগ্রাম ভালো হয় না; কিন্তু হাড়ের আবরণী, লিগামেন্ট, স্নায়ু, মাংসপেশি ও টেন্ডন আল্ট্রাসনোগ্রাম করে এগুলোর অসুখ নির্ণয় করা যায়।

আল্ট্রাসনোগ্রাফির অপকারিতা

যুগের উন্নতির সাথে সাথে টেকনোলজি অনেক অগ্রসরমান হওয়ায় আল্ট্রাসনোগ্রাফির জগতেও অনেক উদ্ভাবন ঘটেছে। এখন খুব সহজেই 4D ব্যবহার করে বাচ্চার মুখাবয়ব পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টেকনোলজির ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। তাই বাচ্চা ও মা সুস্থ থাকলে শুধুমাত্র ফ্যান্টাসি বা বিনোদন হিসেবে 4D ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে 4D তে অনেক বেশি উচ্চ কম্পাংকের শব্দ তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, যাতে মায়ের পেটের ভিতরে অবস্থানরত বাচ্চার অতি সংবেদনশীল টিস্যুর ক্ষতিসাধন হতে পারে। তাই গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসনোগ্রাফির সময় এ ব্যাপারে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই সচেতন থাকা জরুরি।

CT SCAN & MRI

সিটিস্ক্যান (CT Scan)

সিটিস্ক্যান করার কারণ:

- ✓ ক্যান্সার বা টিউমার নির্ণয়।
- ✓ মস্তিষ্কের রোগ বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা নির্ণয়।
- ✓ হৃদযন্ত্রের কোনো রোগ বা রক্ত প্রবাহে কোনো বাধা রয়েছে কিনা জানতে।
- ✓ ফুসফুসের রোগ নির্ণয়।
- ✓ হাড় ভাঙ্গা বা অন্য কোনো সমস্যা নির্ণয়।
- ✓ কিডনী বা মূত্রসংবহন তন্ত্রের কোন রোগ বা পাথর শনাক্তকরণ।
- ✓ পিত্তথলি, লিভার বা অগ্নাশয়ের রোগ নির্ণয়।
- ✓ বায়োপসি করার ক্ষেত্রে গাইড হিসেবে সিটি স্ক্যানের সাহায্য নেয়া হতে পারে।
- ✓ ক্যান্সার রোগীর ক্যান্সারের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে সিটি স্ক্যান করা হয়।
- ✓ এছাড়া যেসব রোগীকে পেস মেকার, ভাল্ভ বা এ জাতীয় যন্ত্র দেয়া হয়েছে তাদের এমআরআই করা যায় না, এ কারণে সিটি স্ক্যান করতে হয়।

এম.আর.আই (M.R.I)

কার্যপদ্ধতি

- ✓ মানবদেহের শতকরা ৭০% ভাগই পানি আর চর্বি। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন পরমাণু। সাধারণত এই পরমাণুগুলো লাটিমের মতো তাদের নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রে এদিক ওদিক ইতস্ততভাবে ঘুরতে থাকে।
- ✓ যদি মানবদেহকে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হয় তবে এই হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহ জোড়ায় জোড়ায় এমনভাবে সজ্জিত হয় যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পরমাণু চৌম্বকক্ষেত্রের উত্তর মেরুর দিকে এবং বাকী প্রায় অর্ধেক সংখ্যক চৌম্বকক্ষেত্রের দক্ষিণ মেরুর দিকে সজ্জিত হয়ে যায়।
- ✓ কিন্তু কিছু হাইড্রোজেন পরমাণু বিজোড় থেকে যায়। এমতাবস্থায় যদি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভ (বেতার কম্পাঙ্কের তরঙ্গ) পালস্ পাঠানো হয় তবে এই বিজোড় পরমাণুগুলো শক্তি গ্রহণ করে বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন করে অপর দিকে ঘুরে যায়।
- ✓ অতঃপর যদি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালস্ বন্ধ করে দেয়া হয় তবে এই পরমাণুগুলো আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে এবং শক্তি নিঃসরণ করে। এই শক্তি কম্পিউটারে সংকেত পাঠায় এবং কম্পিউটার গাণিতিক সূত্র এবং অ্যালগরিদমের সাহায্যে তা দিয়ে সুন্দর চিত্র গঠন করে।
- ✓ এম.আর.আই মেশিনে যে রেডিও পালস পাঠানো হয় তার কম্পাঙ্ক থাকে সাধারণত হাইড্রোজেনের নিজস্ব কম্পাঙ্কের সমান। ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুতে অনুরণন (Resonance) সৃষ্টি হয়। এ কারণেই একে রেজোনেন্স ইমেজিং বলা হয়।

CT SCAN & MRI

সাধারণভাবে এম.আর.আই পরীক্ষা দ্বারা নিম্নলিখিত রোগ নির্ণয় করা যায়:

- ✓ মস্তিষ্কের রোগ, যেমন টিউমার, স্ট্রোক এবং অন্যান্য।
- ✓ মহিলাদের স্তন ও তল পেটের সমস্যা।
- ✓ মেরুদণ্ডের রোগ/আঘাত।
- ✓ প্রস্টেট সমস্যা।
- ✓ জোড়া রোগ ও ক্রীড়াজনিত আঘাত।
- ✓ লিভার, পিত্ত নালী ও কিছু আন্ত্রিক রোগ।
- ✓ হাড় ও মাংসপেশির সমস্যা।
- ✓ নাক, কান ও গলার (ইএনটি) নির্দিষ্ট রোগ, ইত্যাদি।
- ✓ রক্তনালীর অস্বাভাবিকতা।

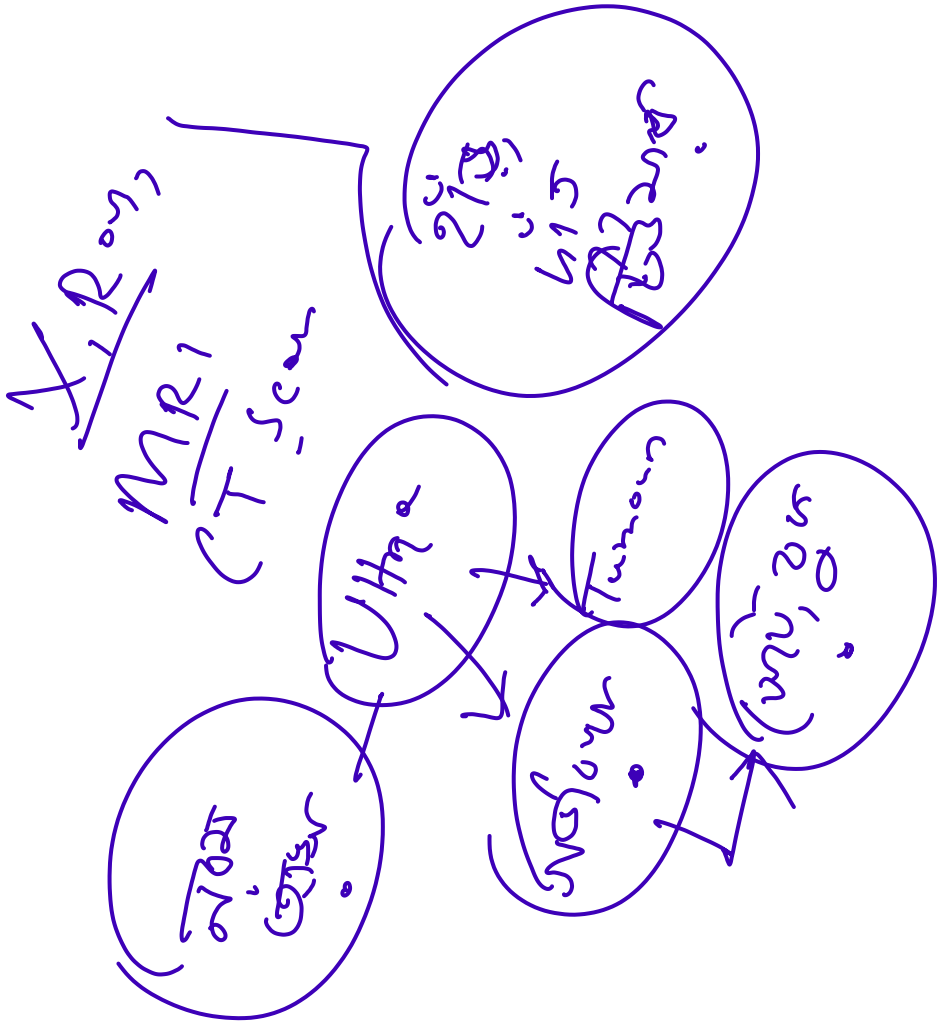

সিটি স্ক্যান ও MRI

CT
Uses radiation
Donut shape
Typically lasts 5 min
Good for seeing organs & bony detail
MRI
No radiation
Tanning bed shape
Can last 30 min or more
Good for seeing soft tissue

ENDOSCOPY & ECG

এন্ডোসকপি

এন্ডোসকপি করার কারণ: যেসব কারণে এন্ডোসকপি করা হয় সেগুলো হলো-

- ✓ পেটব্যথা
- ✓ আলসার
- ✓ গিলতে অসুবিধা
- ✓ খাদ্যনালীতে রক্তপাত
- ✓ পেটের অভ্যাসে পরিবর্তন আসা ইত্যাদি।

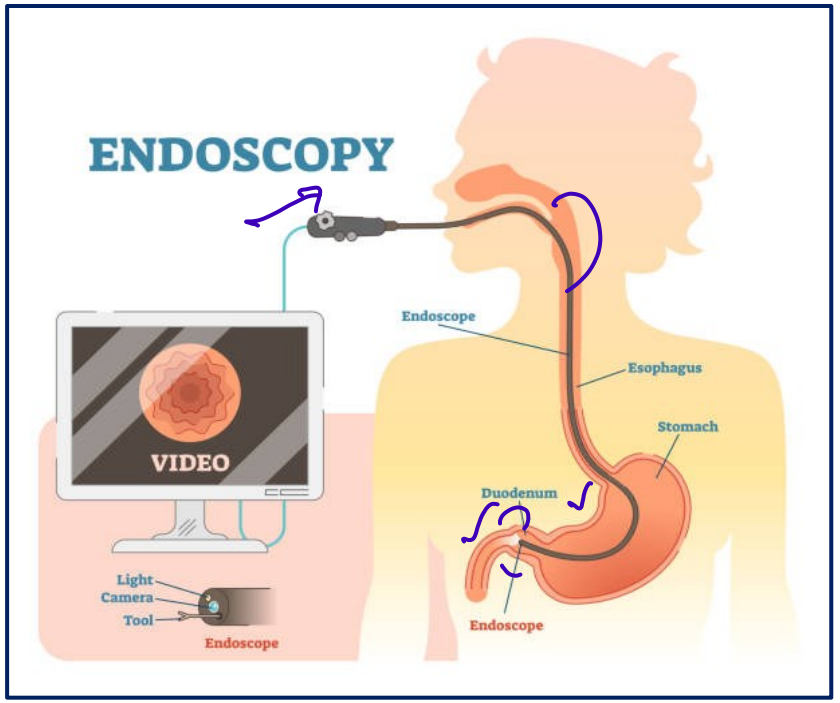

এন্ডোসকপি করার প্রস্তুতি:

- ✓ ৮-১০ ঘণ্টা খালি পেটে থাকতে হবে।
- ✓ ঢোলা কাপড় পড়ে আসতে হয় ইত্যাদি।
- ✓ টেস্ট করার সময় চেতনানাশক স্প্রে বা ঔষধ খাওয়ানো হয়। তবে কোন ঔষধে এলার্জি থাকলে ডাক্তারকে আগেই জানিয়ে দিতে হবে।

এন্ডোসকপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

- ✓ বমি বমি ভাব হতে পারে।
- ✓ পেটে অল্প সময়ের জন্য ব্যথা হতে পারে।
- ✓ [illegible]।
- ✓ অল্প ব্লিডিং হতে পারে।
- ✓ মাইনর ইনফেকশন হতে পারে ইত্যাদি।

ENDOSCOPY & ECG

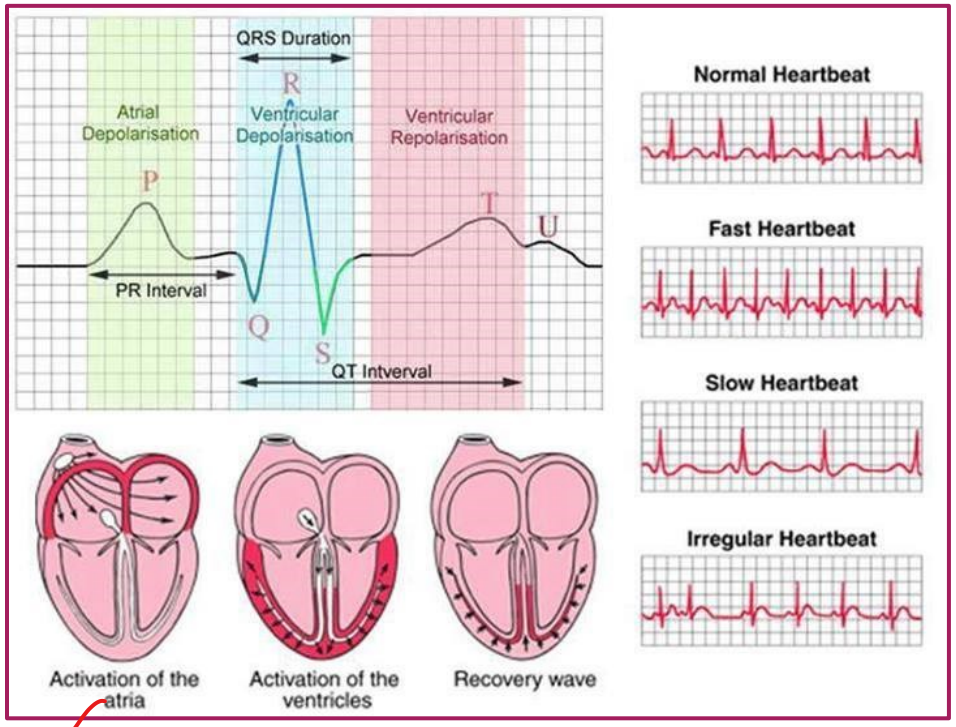

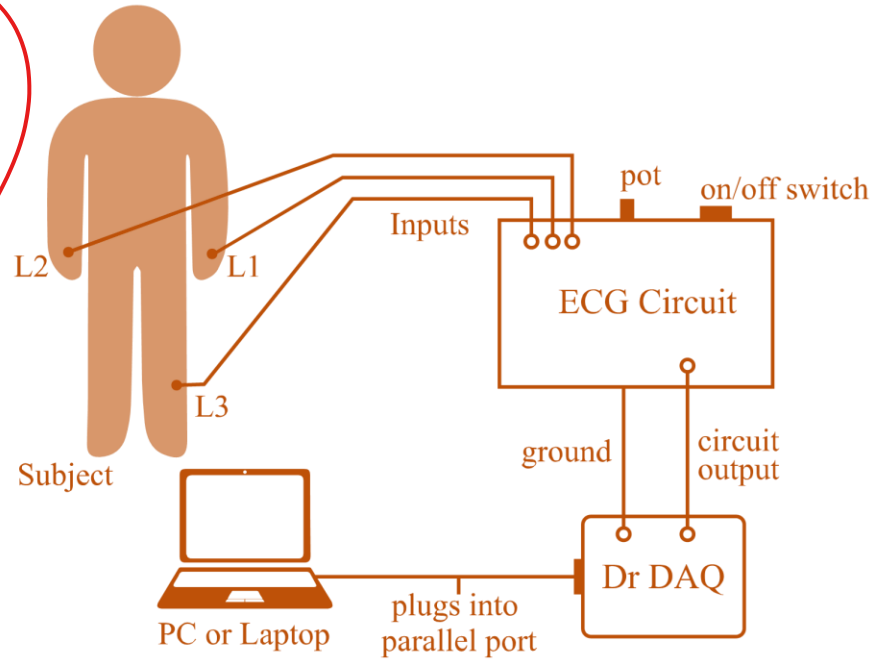

ECG এর কারণ:

- ✓ হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন বা স্পন্দনের হার কম বেশি হলে।
- ✓ হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকলে।
- ✓ হৃৎপিণ্ডের আকার বড় হয়ে থাকলে ইত্যাদি।

ক্যান্সার

ক্যান্সার

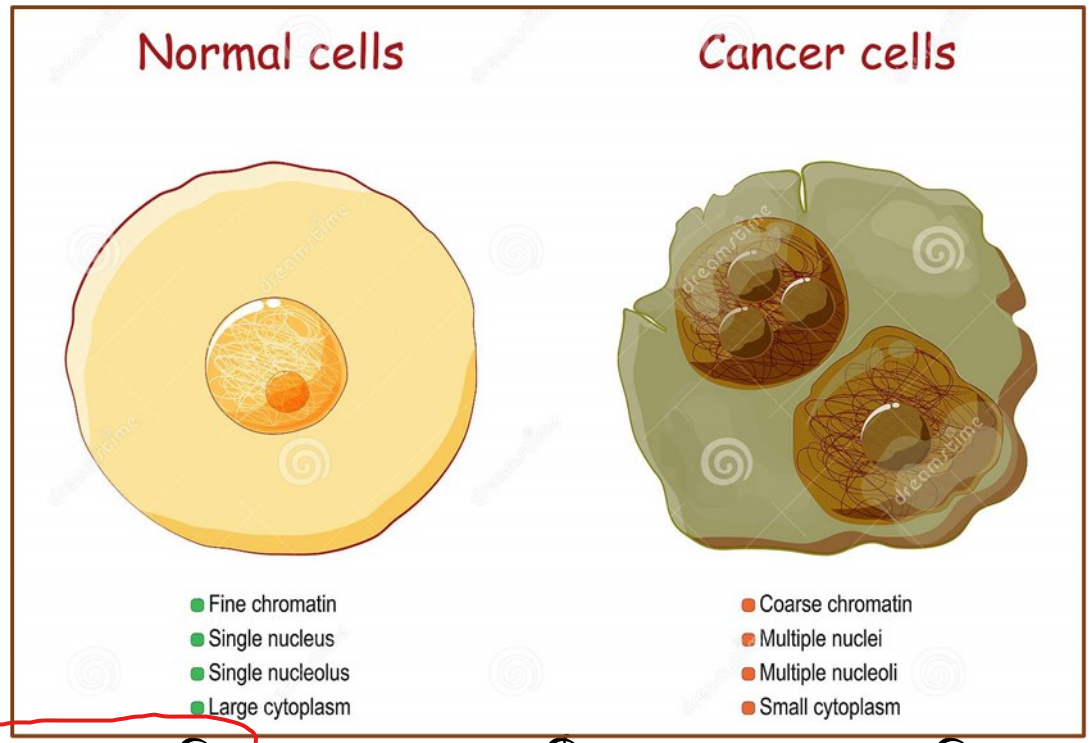

ক্যান্সারের কারণ: ক্যান্সার সংক্রামক ব্যাধি নয়। এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি কেন এই স্বাভাবিক কোষ অস্বাভাবিক কোষে পরিণত হয়। ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান, 'হরমোন' তেজস্ক্রিয়তা, পেশা, অভ্যাস (ধূমপান, তামাক সেবন, মদ্যপান ইত্যাদি), আঘাত, প্রজনন ও বিকৃত যৌন আচরণ, বায়ু ও পানি দূষণ, খাদ্য (যেমন- অত্যধিক চর্বি বা অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য), বিভিন্ন বর্ণগত, জীবন যাপন পদ্ধতিগত, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রভাব, প্যারাসাইট ও ভাইরাস সাধারণত সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ এবং এর প্রায় ৯০ শতাংশই এড়িয়ে চলা সম্ভব।

ক্যান্সার

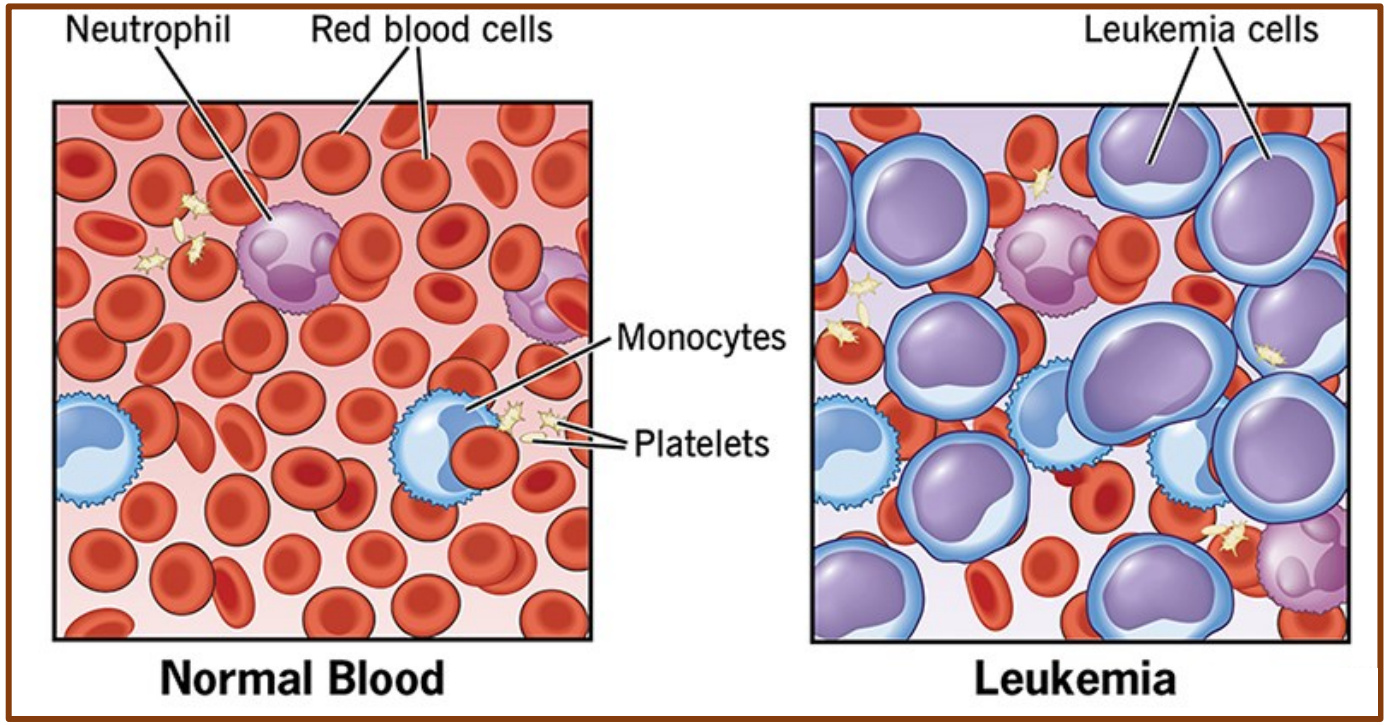
Neutrophil
Red blood cells
Leukemia cells
Monocytes
Platelets
Normal Blood
Leukemia

ক্যান্সার

ক্যান্সারের চিকিৎসা পদ্ধতি: সাধারণত ক্যান্সার তিনটি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই সাথে একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

- **সার্জারি বা শল্য চিকিৎসা:** প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার আক্রান্ত স্থানকে অপারেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে কেটে বাদ দিয়ে শরীর ক্যান্সারমুক্ত করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে ক্যান্সার নিরাময়ের সম্ভাবনা সর্বাধিক।
- **রেডিওথেরাপি বা বিকিরণ চিকিৎসা:** বেশির ভাগ ক্যান্সার রোগীর ক্ষেত্রে সার্জারি কিংবা অন্যান্য চিকিৎসার পাশাপাশি অথবা এককভাবে রেডিওথেরাপির সাহায্যে শরীরের ভেতরেই ক্যান্সার কোষগুলো ধ্বংস করে ফেলা যায়।
- **কোমোথেরাপি:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার্জারি এবং রেডিওথেরাপির পাশাপাশি অথবা আগে বা পরে ক্যান্সার কোষ ধ্বংসকারী ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। বস্তুত রোগ এবং রোগীর অবস্থাভেদে সার্জারি, রেডিওথেরাপি ও কোমোথেরাপি বা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়। তবে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করলে ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের সম্ভাবনা বেশি।

ক্যান্সার

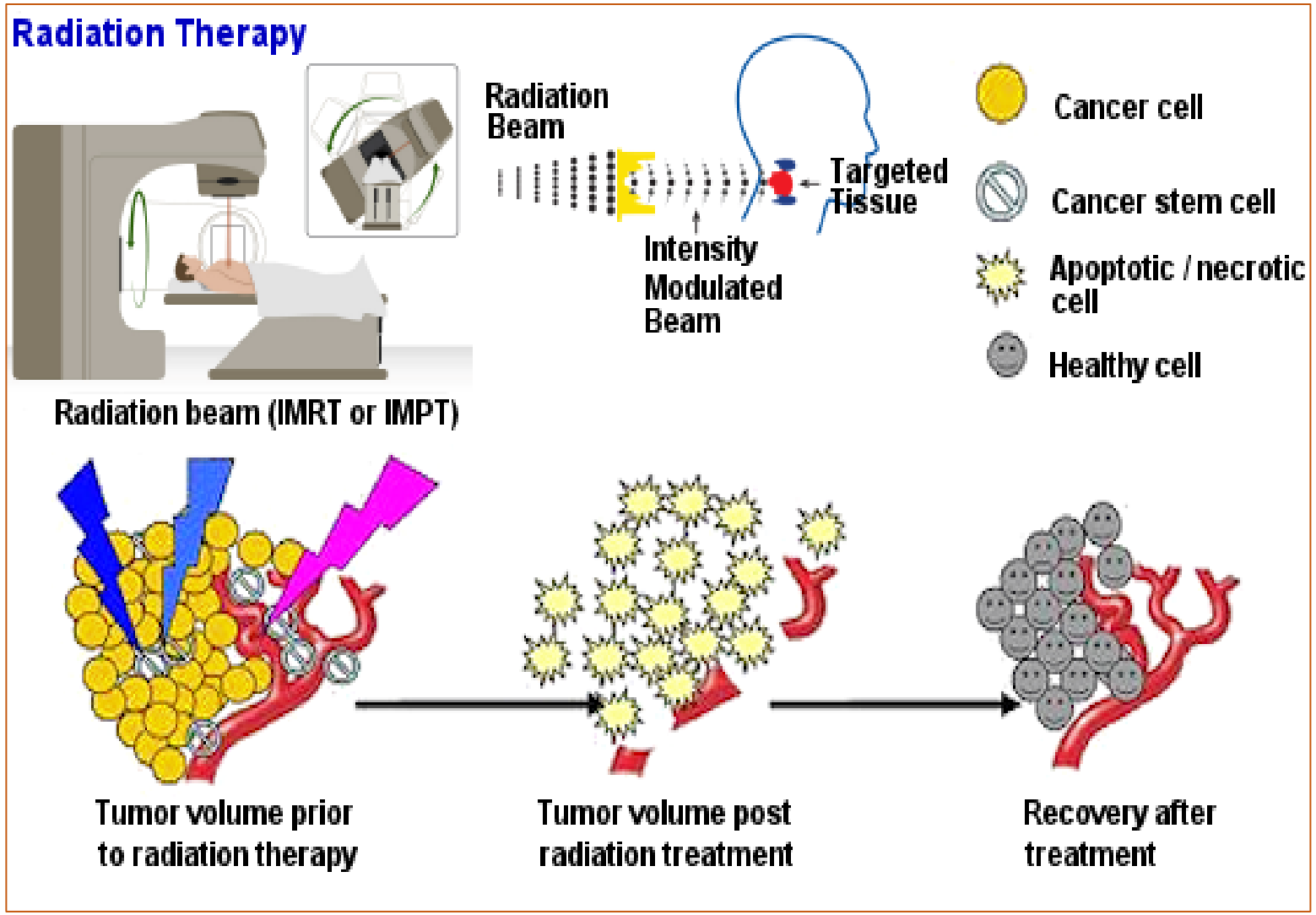
Radiation Therapy
Radiation Beam
Targeted Tissue
Intensity Modulated Beam
Cancer cell
Cancer stem cell
Apoptotic / necrotic cell
Healthy cell
Radiation beam (IMRT or IMPT)
Tumor volume prior to radiation therapy
Tumor volume post radiation treatment
Recovery after treatment

ক্যান্সার

রেডিওথেরাপি

- ✓ ক্যান্সারের প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে।
- ✓ ক্যান্সারজনিত লক্ষণগুলিকে দূর করতে।
- ✓ সার্জারির পরে, অবশিষ্ট ক্যান্সার কোষগুলির বৃদ্ধি বন্ধ করতে।
- ✓ অস্ত্রোপচারের আগে, ক্যান্সারযুক্ত টিউমারগুলিকে কমাতে।
- ✓ ক্যান্সার কোষগুলিকে ধ্বংস করার জন্য অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে, যেমন কেমোথেরাপির সাথে ব্যবহার করা হয়।

ক্যান্সার

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: অনেক সময় রেডিওথেরাপির উচ্চমাত্রার বিকিরণের ফলে ক্যান্সার কোষের আশেপাশে থাকা কিছু সুস্থ কোষও নষ্ট হয়ে যায়। এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মাথা, ঘাড় ও বুকে রেডিওথেরাপি প্রয়োগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে চুল পড়ে যাওয়া, ক্লান্তি ও অবসাদ, বমি বমি ভাব ইত্যাদি হতে পারে। আবার পরিপাক ও জনন তন্ত্রের দিকে রেডিওথেরাপি প্রয়োগে বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, চুল পড়ে যাওয়া, যৌনক্ষমতা জনিত সমস্যা ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

প্রোটন বিম থেরাপি: বর্তমানে X-ray এর পরিবর্তে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন পজেটিভ চার্জযুক্ত প্রোটন কণা বিচ্ছুরণ ব্যবহার করেও রেডিওথেরাপি দেয়া হয়।

ইন্টারনাল রেডিও থেরাপি: ইন্টারনাল রেডিও থেরাপিতে শস্যদানার আকৃতিবিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল ক্যান্সার আক্রান্ত অংশের কাছাকাছি সার্জারির মাধ্যমে স্থাপন করা হয়। প্রতিনিয়ত এই ক্যাপসুল থেকে বিকিরণ নির্গত হয়ে ক্যান্সার কোষে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

উপরিউক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলো বর্তমানে ক্যান্সার চিকিৎসায় প্রচলিত পদ্ধতি। আধুনিক অণুপ্রাণ বিজ্ঞান, অণুজীব বিজ্ঞান, জেনেটিক্স, ন্যানোটেকনোলজির অগ্রগতির ফলে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে নতুন ধরনের আশার আলো দেখছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ।

কেমোথেরাপি

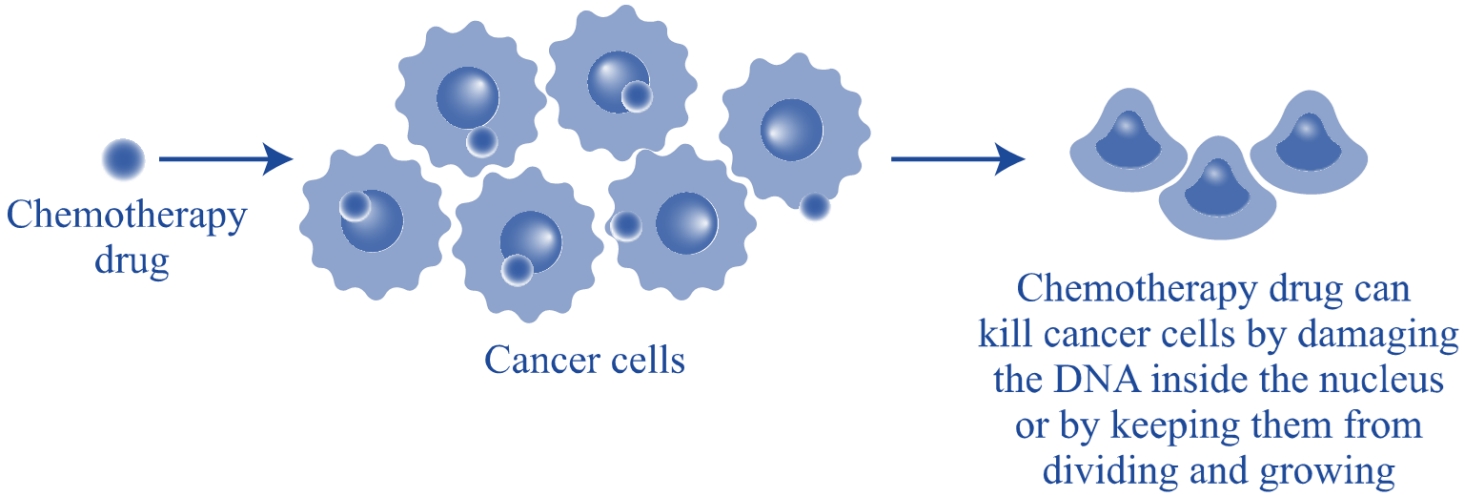

কেমোথেরাপির প্রয়োগ পদ্ধতি:

রোগীর স্বাচ্ছন্দ্য এবং রোগের তীব্রতার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন উপায়ে কেমোথেরাপি দেয়া যেতে পারে। এগুলো হলো-

- ইনজেকশন: এই প্রক্রিয়ায় ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রবিষ্ট করা হয়।
- ওরাল: ঔষধ বড়ি বা ক্যাপসুল হিসেবে।
- টপিকাল: ক্রিম হিসেবে ত্বকে মালিশ করে।

ক্যান্সার

কেমোথেরাপির প্রধান লক্ষ্যগুলো হচ্ছে:

✓ ক্যান্সার পুরোপুরি ধ্বংস করা (সর্বোত্তম ফলাফল)।
✓ ক্যান্সার ছড়ানো ও বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করা।
✓ প্যালিয়েশন বা রোগের উপসর্গ বা ব্যথা প্রশমিত করা।

ক্যান্সারের ধরন, রোগীর মেডিকেল ইতিহাস, শারীরিক স্থানের প্রকৃতি, শারীরিক ওজন, বয়স ও ক্যান্সারের পর্যায়ের ওপর কেমোথেরাপির ডোজ, শিডিউল ও ওষুধ নির্ভর করে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতবার কেমোথেরাপি দিতে হবে রোগীভেদে তা ভিন্ন হতে পারে।

কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

✓ কেশগ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
✓ প্রজননতন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।
✓ মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে।
✓ বমি বমি ভাবের উদ্রেক ঘটে।
✓ ত্বক এবং নখ শুকিয়ে আসে।
✓ ঘন ঘন মন মেজাজের পরিবর্তন ঘটে।

এনজিওগ্রাফি

এনজিওগ্রাফি (Angiography)

এনজিওগ্রাফি কোনো অঙ্গে রক্তের প্রবাহকে নিরীক্ষণের জন্য করা হয়। ধমনিগুলো স্বাস্থ্যকর আছে কিনা এবং এর মধ্য দিয়ে কিভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তা জানার জন্য এটি করা হয়। এটি রক্ত প্রবাহী ধমনিগুলোর অবস্থা নিরূপণে সাহায্য করে। অনেকক্ষেত্রে এনজিওগ্রাফি করার দরকার হয় যার মধ্যে নিচে কিছু উল্লেখ করা হলো-

- ✓ যে ব্যক্তির অ্যানজিনা আছে - যদি একজন ব্যক্তি বুকে অস্বাভাবিক ব্যথা বা চাপ অনুভব করেন, যেটা কাঁধে, হাতে, গলায়, চোয়ালে অথবা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে এনজিওগ্রাফি করতে বলা হয়।
- ✓ যে ব্যক্তির কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে - যদি কোনো ব্যক্তির হৃদস্পন্দন হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পরিস্থিতি বোঝার জন্যে এনজিওগ্রাফি করা হতে পারে।
- ✓ যদি ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম, এক্সারসাইজ স্ট্রেস টেস্ট এবং অন্য পরীক্ষাতে দেখা যায় যে কোনো ব্যক্তির হৃদরোগ আছে, তাহলে অবশ্যই এনজিওগ্রাফি করতে হবে।
- ✓ যদি একজন ব্যক্তি হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হন, জরুরি ভিত্তিতে করোনারি এনজিওগ্রাফি করা হয়।

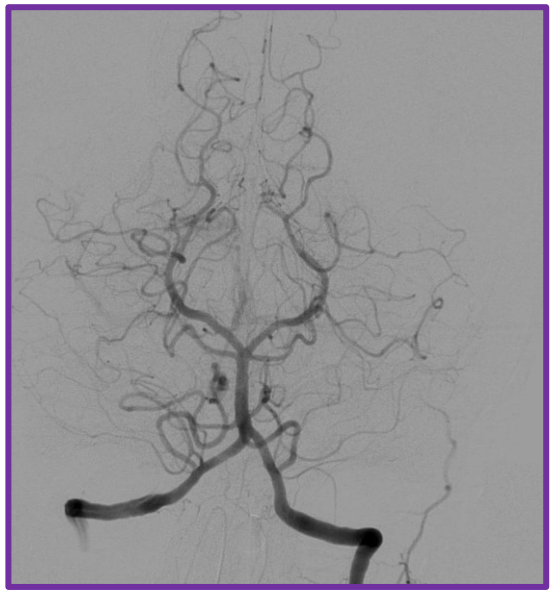

AIDS

এইডস (AIDS)

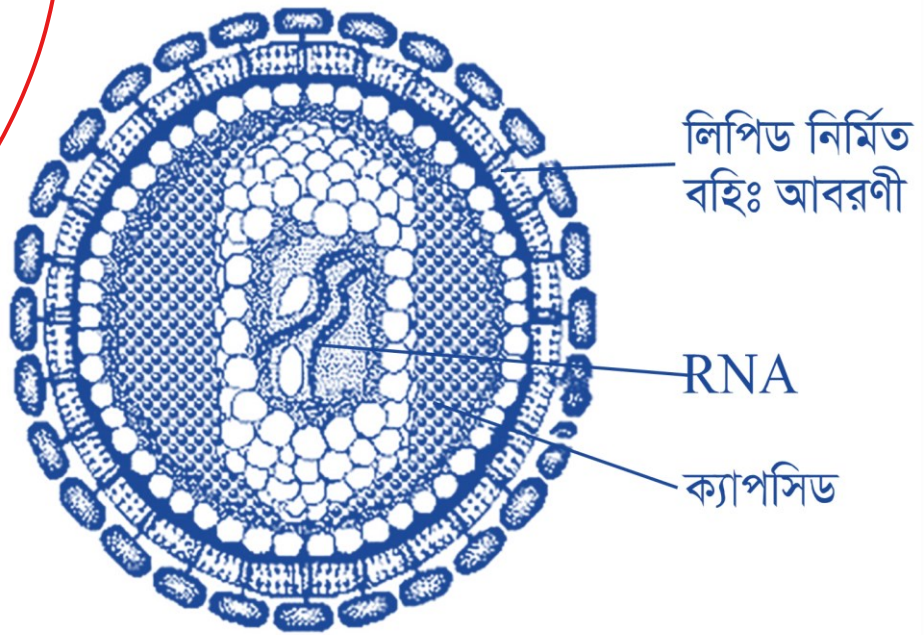

AIDS

HIV যেভাবে ছড়ায়:

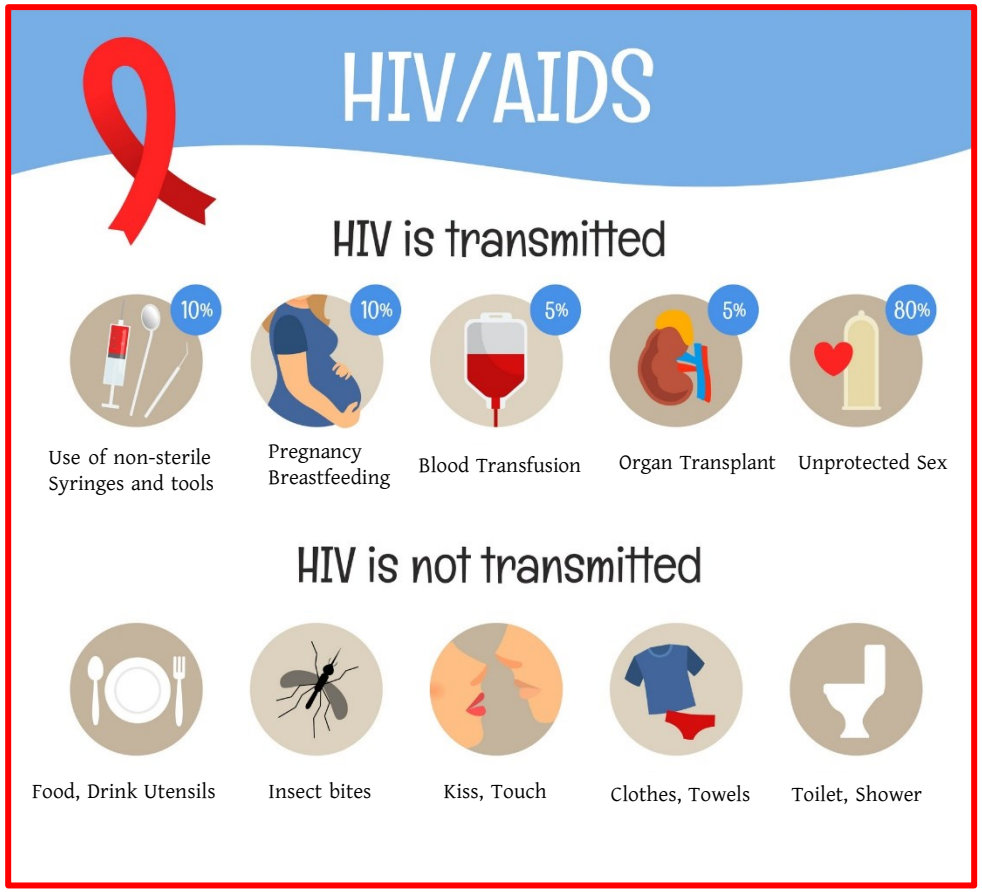

AIDS

এইডস প্রতিরোধে করণীয়:

- ✓ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এইডস প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা।
- ✓ শরীরে রক্ত বা কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহণের প্রয়োজন হলে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে, সে রক্ত বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এইচআইভি নেই।
- ✓ একবার ব্যবহার করা যায় এমন জীবাণুমুক্ত সূঁচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- ✓ পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সূঁচ, সিরিঞ্জ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে নিশ্চিতভাবে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
- ✓ দেখা গেছে, যৌনরোগ বা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ থাকলে এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই কারও যৌনরোগ বা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে।
- ✓ জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রতিরোধমূলক তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

এইডসের কোনো প্রতিষেধক বা টিকা আবিষ্কার হয়নি। এর যে চিকিৎসা বের হয়েছে তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাছাড়া এ চিকিৎসা শুধু এইডস আক্রান্তের সময়কে বিলম্বিত করে, এইডস পুরোপুরি নিরাময় করে না।

ভাইরাল হেপাটাইটিস

সংজ্ঞা	• ভাইরাল হেপাটাইটিস হলো ভাইরাসঘটিত লিভারের প্রদাহজনিত রোগ।
বিশেষ তথ্য	• অধিকাংশ হেপাটাইটিস-ই HBV এর আক্রমণ ঘটে থাকে। • HCV-কে তুষের আগুন/নীরব ঘাতক বলে। • লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যান্সার হেপাটাইটিস B ও C ভাইরাসের সংক্রমণে হয়

বৈশিষ্ট্য	HAV	HBV	HCV	HDV	HEV
ভাইরাস গ্রুপ	এন্টারো ভাইরাস	হেপাডিএনএ ভাইরাস	ফ্ল্যাভি ভাইরাস	অসম্পূর্ণ ভাইরাস	ক্যালিসি ভাইরাস
নিউক্লিক অ্যাসিড	RNA	DNA	RNA	RNA	RNA

ভাইরাল হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস বলতে যকৃতের প্রদাহ (ফুলে যাওয়া) বোঝায়। ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ বা অ্যালকোহলের মতো ক্ষতিকারক পদার্থের কারণে ঘটা যকৃতের একটি রোগ। হেপাটাইটিস অল্প কিছু উপসর্গসহ বা কোনো উপসর্গ ছাড়াই ঘটতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জন্ডিস, এনরেক্সিয়া (ক্ষুধমান্দ্য) ও অসুস্থতাবোধ এর লক্ষণ বা উপসর্গ। হেপাটাইটিসের ৫ টি ভাইরাস হল এ, বি, সি, ডি এবং ই। এর মধ্যে টাইপ-বি এবং সি মারাত্মক রূপ নেয় এবং লিভার সিরোসিস এবং ক্যান্সারের মতো মারাত্মক আকার ধারণ করে।

এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ ও জটিলতা তৈরি করে কেবল হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস। বিশ্বে হেপাটাইটিস বি অথবা সি আক্রান্ত প্রায় ৯০ শতাংশ লোকই জানে না যে তারা এ ভাইরাস বহন করে চলেছে। ফলে না জেনেই তারা ভাইরাসটি ছড়াতে থাকে। বাংলাদেশেও প্রায় এক কোটি মানুষ বি অথবা সি ভাইরাসে আক্রান্ত।

হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ: রোগের বিস্তার না ঘটা পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো নির্দিষ্ট লক্ষণ স্পষ্ট হয় না। হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হলে শরীর দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, পেটব্যথা, শরীর হলুদ বর্ণ ধারণ করা এবং হলুদ প্রস্রাবের মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে রোগের বিস্তার ঘটলে পেটে পানি আসা, রক্ত পায়খানা ও রক্তবমি হতে পারে। এমনকি রোগী চেতনাও হারাতে পারে।

ভাইরাল হেপাটাইটিস

যেভাবে ছড়ায়: হেপাটাইটিস এ এবং ই ভাইরাস খাদ্য ও পানির মাধ্যমে ছড়ায়। এগুলোর সংক্রমণে যে জন্ডিস হয়, তা সাধারণত সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। কিন্তু হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস অনিরাপদ যৌনসংস্পর্শ, অনিরাপদ রক্ত গ্রহণ, ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ, একাধিক ব্যক্তির একই ব্লেড-কাঁচি ব্যবহার, অনিরাপদ দাঁতের চিকিৎসা বা বিভিন্ন অনিরাপদ অস্ত্রোপচার এবং সন্তান জন্মদানের সময় আক্রান্ত মা থেকে শিশুতে সংক্রমণ হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রক্তের নানা ধরনের অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ শনাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা: এ এবং ই ভাইরাস সংক্রমণজনিত হেপাটাইটিস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আপনা-আপনি ভালো হয়ে যায়। অল্প কিছু ক্ষেত্রে শুধু বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। বি ভাইরাস নির্মূল করা না গেলেও চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সি ভাইরাসও চিকিৎসার মাধ্যমে নির্মূল করা যায়। অনেকের ধারণা, হেপাটাইটিস বি বা সি সংক্রমণ হলে আর কোনো আশা নেই, লিভার বা যকৃত নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে এ দুটো ভাইরাস নির্মূলের জন্য আধুনিক অ্যান্টি-ভাইরাল থেরাপি রয়েছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসকের পরামর্শে, প্রয়োজনে জীবনব্যাপী গ্রহণ করে যেতে হবে। এ ছাড়া হেপাটাইটিস এ ও বি-এর প্রতিষেধক টিকা আছে, যার মাধ্যমে এসব ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভব। সঠিক সময়ে প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা না করালে হেপাটাইটিস থেকে যকৃত অকার্যকর হয়ে পড়া বা লিভার ফেইলিউর, লিভার সিরোসিস বা ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে ।

VACCINATION

ভ্যাক্সিন বা টিকা

রোগের নাম	টিকার নাম
যক্ষ্মা	বিসিজি
পোলিও-মাইলিটিজ	ওপিভি
১. ডিপথেরিয়া ২. হুপিং কাশি ৩. ধনুষ্টংকার ৪. হিমোফাইলাস বি ইনফ্লুয়েঞ্জা, ৫. হেপাটাইটিস বি	পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা
নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া	পিসিভি
হাম ও রুবেলা	এম আর ভ্যাকসিন
ধনুষ্টংকার	টিটি

রাতকানা

রাতকানা (Night Blindness) বলতে রাতে স্বল্প আলোয় দেখার অক্ষমতা। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ রোগের নাম নিকটালোপিয়া (Nyctalopia)। ভিটামিন-'এ' এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। চোখের রেটিনার রডকোষ স্বল্প আলোতে দেখার জন্য কার্যকর। ভিটামিন-'এ' এর অভাবে এগুলোর অন্ধকারের সাথে চোখের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পায় এবং পরিণামে রাতের কম আলোতে রোগী দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। রোগীর এ অবস্থাকে রাতকানা রোগ বলে।

রাতকানা রোগের কারণ:

- ✓ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত ও পরিমাণমতো না খাওয়া।
- ✓ হাম, ডায়রিয়া, অপুষ্টিজনিত অথবা অন্য কোনো কারণে শরীরে ভিটামিন 'এ'-এর অভাব।
- ✓ 'রেটিনিটিস পিগমেন্টোসা' হলো একটি জন্মগত রাতকানা রোগ যা জিনগত ত্রুটির কারণে হয় (ভিটামিনের অভাবে নয়)।
- ✓ বাড়ন্ত বয়সে অতিরিক্ত খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে না পারলে এই রোগ হতে পারে।
- ✓ অনেক সময় দেখা গিয়েছে রাতকানা রোগটি বংশগতভাবে হয়ে এসেছে। তবে, এটি ছোঁয়াচে না। চোখে ছানি পড়ার কারণে এ রোগটি হতে পারে।
- ✓ দৃষ্টি ক্ষীণতা বা মাইয়োপিয়া রোগের চিকিৎসা না করা হলে রাতকানা রোগ হতে পারে।
- ✓ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি রোগের কারণে রাতকানা রোগ হওয়া সম্ভব।
- ✓ গ্লাইকোমিয়া ওষুধ গ্রহণ করলে রাতকানা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- ✓ ভিটামিন-'এ' এবং জিঙ্কের অভাব একটি বড় কারণ হতে পারে রাতকানা রোগের।

রাতকানা

রাতকানা রোগ প্রতিকারে পদক্ষেপ:

- ✓ ভিটামিন-‘এ’ জাতীয় খাবার, যেমন: টাটকা শাকসবজি, গাজর, টমেটো, ছোট মাছ খাওয়া;
- ✓ ভিটামিন-‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো;
- ✓ মাছের মাথা, কডলিভার অয়েল ইত্যাদি খাওয়ানো এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

যক্ষ্মা

যক্ষ্মা

- যক্ষ্মা একটি সংক্রামক ব্যাধি।
- যা প্রধানত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। তবে ফুসফুস ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন স্থানে যক্ষ্মা হতে পারে। যেমন- লসিকাগ্রন্থি, হার ও গিট, অন্ত্র, হৃৎপিণ্ডের আবরণ ও মস্তিস্কের আবরণ ইত্যাদি।
- মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস (Mycobacterium tuberculosis) নামক ব্যাক্টেরিয়া এই রোগের জন্য দায়ী।

লক্ষণ: সাধারণত সন্ধ্যা বেলায় জ্বর আসে। খাবার খাওয়া সত্ত্বেও শরীর শুকিয়ে যায়। ৩ সপ্তাহের অধিক কফ হয়। সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক খেলেও সারে না। একটা সময় দেখা যায় যে কফের সঙ্গে রক্ত আসছে। অনেক ক্ষেত্রে রক্ত নাও আসতে পারে। ওজন কমে যায়। ক্ষুধামান্দ্য হয়ে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। সাধারণত ফুসফুসের যক্ষ্মায় এসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্য কোন যক্ষ্মার ক্ষেত্রে লক্ষণ নাও থাকতে পারে।

যক্ষ্মা

যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধের উপায়:

- ✓ জন্মের পর পর প্রত্যেক শিশুকে বিসিজি টিকা দিতে হবে।
- ✓ পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- ✓ বাসস্থানের পরিবেশ খোলামেলা, আলো-বাতাস সম্পন্ন হতে হবে।
- ✓ জনাকীর্ণ পরিবেশে বসবাস যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।
- ✓ ডায়াবেটিস জাতীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী রোগের ক্ষেত্রে, সুষ্ঠু চিকিৎসা নিতে হবে।
- ✓ যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীকে সবসময় নাক মুখ ঢেকে চলাচল করতে হবে।
- ✓ যক্ষ্মা জীবাণুযুক্ত রোগীর সঙ্গে কথা বলার সময় একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

RH ফ্যাক্টর

স্বামী-স্ত্রীর রক্ত কেমন হওয়া উচিত: স্বামীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হলে স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ নেগেটিভ যেকোনো একটি হলেই হবে। তবে স্বামীর রক্তের গ্রুপ যদি পজেটিভ হয় তবে স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ অবশ্যই পজেটিভ হতে হবে।

রক্তের Rh ফ্যাক্টর এক না হলে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে: স্বামীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ আর স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হলে শরীরে লিথাল জিন বা মারণ জিন নামে একটি জিন তৈরি হয় যা তাদের মিলনে সৃষ্ট জাইগোটকে মেরে ফেলে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মৃত বাচ্চার জন্ম হয়। স্বামীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ হলে সন্তানের রক্তের গ্রুপও পজিটিভ হয়ে থাকে। স্বামীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ আর স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হয়ে থাকলে স্ত্রী পজেটিভ গ্রুপের একটি ফিটাস বা ভ্রুণ ধারণ করে থাকে। ডেলিভারির সময়ে পজেটিভ ফিটাসের ব্লাড, প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার বা ভ্রুণফুল displacement ঘটবে। এর ফলে স্ত্রীর শরীরে নতুন ব্লাড গ্রুপের একটি আর এইচ এন্টিবডি তৈরি হবে। এটি প্রথম সন্তানের জন্মের সময়ে কোনো সমস্যা তৈরি করবে না। কিন্তু দ্বিতীয়বার সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বের সন্তান জন্মের সময়ে তৈরি হওয়া Rh এন্টিবডি শরীরের ভ্রূণের প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ারকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। এর ফলে দ্বিতীয় সন্তান জন্মের সময়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ কিংবা মৃত সন্তানের জন্ম হতে পারে। একে মেডিকেলের ভাষায় আরএইচ incompatibility বলা হয়। এর প্রতিকারের জন্য Rh- মাকে Anti-D নামে একটি ইনজেকশন নিতে হবে রুটিনমাফিক, প্রথম বাচ্চা জন্মের পরপরই অথবা প্রথমবার গর্ভপাতের পরে। এই Anti-D মা'র রক্তে উপস্থিত Rh+ রক্তকোষকে ধ্বংস করে, যাতে এগুলো আর কোন এ্যান্টিবডি তৈরি করতে না পারে। কোনো কোনো সময়ে এটা গর্ভকালীন সময়েও দেয়া হয়ে থাকে, সাধারণত ২৪তম থেকে ৩৬তম সপ্তাহের মধ্যে।

DDT ও মানব শরীরে এর প্রতিক্রিয়া

মানব শরীরে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া:

- ডিডিটির বিষক্রিয়ায় পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাশয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- এর ফলে মানুষ স্নায়ুবিক শৈথিল্য সমস্যায় ভুগতে শুরু করে।
- ডিডিটির প্রভাবে বিশেষ করে ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধদের স্নায়ুঘটিত আলঝেইমার রোগের ঝুঁকি ও ব্যাপকতা বাড়ে।
- ডিডিটি মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- যদি কোনো মা ডিডিটি মিশ্রিত খাদ্য বেশি মাত্রায় গ্রহণ করে তবে ঐ মায়ের শালদুধের মাধ্যমে সন্তানেরও ক্ষতি হয়। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপির মধ্যে পার্থক্য লিখুন। থেরাপি দুটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো লিখুন।

[৪৪তম বিসিএস লিখিত]

- কীভাবে ঔষধ ছাড়া রক্তে চিনি ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় লিখুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- খাদ্যে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণই কী রক্তে কোলেস্টেরল কমানোর উপায়? ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- মানুষের রোগনিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যরক্ষায় আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

[৪৩তম বিসিএস লিখিত]

- এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ও আলট্রাসনোগ্রাফি কী ধরনের রোগ নির্ণয়ে সক্ষম উল্লেখ করুন।

[৪৩তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপি। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিবডির-এর পার্থক্য লিখুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- LDL ও HDL কী? মানবদেহে এদের কাজ বর্ণনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- রক্তের Rh ফ্যাক্টর কী? এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- ডেঙ্গু জ্বরের কারণ ও লক্ষণসমূহ লিখুন। ডেঙ্গু ভাইরাসের জেনেটিক উপাদান লিখুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- ডেঙ্গু ভাইরাসের বিস্তার রোধে আমাদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর নয় কেন? [৪০তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- রাতকানা রোগ কী? কী কারণে রাতকানা রোগের সৃষ্টি হয় বিস্তারিত আলোচনা করুন। এ রোগ প্রতিকারে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? **[৪০তম বিসিএস লিখিত]**
- খাদ্যাভ্যাস শরীরের ওজন বাড়ায় পরবর্তীতে তা কীভাবে ডায়বেটিস-এর কারণ হয়ে দাঁড়ায় আলোচনা করুন। **[৪০তম বিসিএস লিখিত]**
- চারটি পানিবাহী রোগের নাম লিখুন। বেরিবেরি রোগের কারণ কী? সূর্যরশ্মিতে ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়-ব্যাখ্যা করুন। **[৪০তম বিসিএস লিখিত]**
- রক্ত কণিকাসমূহ কী কী? রক্ত লাল দেখায় কেন? হেপাটাইটিস কী? কী কারণে হেপাটাইটিস হয়? রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিক দুটি হেপাটাইটিস ভাইরাসের নাম লিখুন। **[৪০তম বিসিএস লিখিত]**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- অ্যান্টিসেপটিক কী? চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত তিনটি উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিসেপটিকের নাম লিখুন।
  [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- উচ্চ রক্তচাপ কী? এর লক্ষণ ও কারণসমূহ আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- ডায়াবেটিক ও ইনসুলিনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- রোগ নির্ণয়ে আল্ট্রাসনোগ্রাফির ৪টি গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- মাদকাসক্তি কি? মানুষ কেন মাদকাসক্তিতে আসক্ত হয়? মাদকাসক্তি থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?
  [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- DDT মানব শরীরে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়